বাংলা ভাষাচর্চা

বাংলা ব্যাকরণ। সপ্তম শ্রেণি

বাগধারা • সন্ধি • সমাস • শব্দ • ধ্বনি • অব্যয় • বাক্য • কারক
• উদ্দেশ্য • বিধেয় • কর্ম • কর্তা • শব্দ ভাণ্ডার • প্রত্যয় • বিশেষ্য
• বিশেষণ • অনুচ্ছেদ • ক্রিয়া • সর্বনাম • পত্ররচনা • ণত্বষত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

সপ্তম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা ব্যাকরণের বই ‘বাংলা ভাষাচর্চা’ প্রকাশ করা হলো। এই ‘বাংলা ভাষাচর্চা’ বইটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। ব্যাকরণ অংশ যেমন ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানকে নির্ভুল ও যথাযথ করবে, তেমনি নির্মিতি অংশ সাহায্য করবে তাদের সৃজনশীল লেখালিখির ক্ষেত্রে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা জোগাতে এবং ব্যাকরণের মতো তথাকথিত নীরস বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

‘বাংলা ভাষাচর্চা’ বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

মার্চ, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

সপ্তম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাচর্চা' পুস্তকটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাপাঠ' বইগুলির সম্প্রসারণ উচ্চ-প্রাথমিকের এই বই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক এই পুস্তকে ব্যকরণের ধারণা এবং বিবিধ প্রয়োগকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার সারস্বত নিয়ামক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চম তল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা

মিথুন নারায়ণ বসু ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

হীরাব্রত ঘোষ

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার শব্দ ১

বাংলা বানান ১৩

নানারকম শব্দ ২০

শব্দ তৈরির কৌশল ২৬

কারক : বিভক্তি ও অনুসর্গ ৩৭

নির্মিতি

পত্ররচনা ৫১

প্রবন্ধ রচনা ৫৯

এককথায় প্রকাশ ৬৫

বাগ্‌ধারা ৬৯

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষার শব্দ

ভাষা একটা বহতা নদীর মতো। নদী যেমন একদিক ভাঙে, একদিক গড়ে, ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় এককালে বহুল প্রচলিত অজস্র শব্দ হয়তো অপ্রচলনের অন্ধকারে বিস্মৃত হয়ে গেল; আবার নতুন বহু শব্দ, অনেকক্ষেত্রে তা সরাসরি বিদেশি ভাষা থেকে ধার করা, হয়তো নিত্যপ্রচলনের মর্যাদা পেয়ে গেল। সব ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে অজস্র শব্দ এসে তার শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে ভাষার ঐশ্বর্যই কেবল বেড়েছে, তার অস্তিত্ব কখনো বিপন্নতার মুখে পড়েনি মোটেই। একথা ঠিক যে গোটা পৃথিবীতেই বহু ভাষা বিপন্নতার মুখে। কিন্তু ভাষার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কট্টর ও অনুদার গোঁড়ামি মোটেই কাজের কথা নয়।

একসময়ে আরবি-ফারসি ভাষার অভিঘাতে অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন বাংলা ভাষার অবসান ঘটবে। অথচ আজ বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটা বড়ো অংশই আরবি ও ফারসি শব্দে ভরা। এমনকী 'কলম' বা 'হাওয়া' বা 'চশমা' বা 'চাকরি' শব্দগুলো যে আদতে বাংলা নয়, মনেই হয় না। একসময়ে আরবি-ফারসি রাজভাষা ছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ভাষাও। এই প্রতিপত্তির কারণ সেটাই। পরে সেই জায়গা নিয়েছে ইংরিজি। অন্য

ভাষা থেকে শব্দ ধার করা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। বরং সেটাই একটা জীবিত ভাষার লক্ষণ। অন্য ভাষার শব্দসম্ভার একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারকে শুধু সমৃদ্ধই করে না, সেই ভাষার ভাব আর অর্থ প্রকাশের পরিধি ও সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে তোলে। বাংলা ভাষায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ ভাবের আদান-প্রদান করেন, এই ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ঈর্ষণীয়। আর এই ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে অসংখ্য শব্দ ঋণ-বাবদ গ্রহণের সূত্রেই।

বাংলা ভাষা কোথা থেকে এসেছে — এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই 'সংস্কৃত' বলবে। এই ভুলটা অনেকেই করে। বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলোকেও বলা হয় নব্যভারতীয় আর্যভাষা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা আর মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার স্তর পেরিয়ে এই ভাষাগুলি আজকের চেহারা পেয়েছে। বেদ যে ভাষায় রচিত, সেই ছান্দস্ বা বৈদিক ভাষাকেই বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। কালক্রমে এই ভাষা যত ছড়িয়ে পড়তে থাকল ততই বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা প্রভাবে ছান্দস্ ভাষাও নানারকম রূপ নিতে লাগল। এই স্তরটিকেই বলা হয় মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার যুগ। এই ভাষাগুলির সাধারণভাবে নাম দেওয়া হলো প্রাকৃতভাষা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গোটা ভারতে মান্য একটি ভাষার প্রয়োজনে ছান্দস্ ভাষার আদর্শে পাণিনি নামে এক পণ্ডিত মানুষ সমসময়ে প্রচলিত ভাষার সংস্কার করেন। সংস্কার করা হলো বলেই এই ভাষারও নাম হলো 'সংস্কৃত'। সুতরাং, সেই অর্থে সংস্কৃত একটি কৃত্রিম ভাষা, বাংলা ভাষার জননী

কিন্তু ওই প্রাকৃতভাষাগুলিই। তবে অন্য যে-কোনো প্রাদেশিক ভাষার মতোই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারেরও অন্তত চল্লিশ শতাংশ জুড়ে সংস্কৃত শব্দই রয়েছে।

এই প্রাকৃতভাষাগুলিই পরবর্তী সময়ে অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি স্তর পেরিয়ে আজকের নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে। অহমিয়া বা ওড়িয়ার মতো বাংলা ভাষারও জন্ম এইভাবে মাগধী প্রাকৃত থেকে হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

কিন্তু, আর্যরা আসার আগেও তো এদেশে অন্য মানুষেরা ছিলেন। আর পূর্বভারত তথা বাংলায় আর্যদের আগমন ঘটেছে অনেক পরে, গুপ্তযুগে। এই যে প্রাগার্য মানুষেরা, এঁদের ভাষার বেশিরভাগ শব্দই এখন অপ্রচলনের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

এই হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। তবু তারই মধ্যে কিছু শব্দ রয়ে গেছে। শিকড়ের দিক থেকে কোনো শব্দ অস্ট্রিক, কিছু দ্রাবিড়, কিছু বা মঙ্গোলয়েড। এই শব্দগুলিই বাংলা শব্দভাণ্ডারের সবথেকে প্রাচীন শব্দাবলি। খাঁটি দেশি শব্দ একমাত্র এগুলিকেই বলা চলে।

১. খাঁটি দেশি শব্দ

ধামা, ঢোল, মাঠ, ঝাঁটা, খোঁপা, টোপর, চট, ডিঙি, ঘুড়ি, ঘ্যাঁট, চাল, শিকড়, কচি, দর, ছড়ি, মুড়ি, ঢেঁকি, লাঠি, তেঁতুল, চিংড়ি, কাতলা, ফিঙে, দোয়েল, ঘোমটা, গাড্ডু, কলা, ঝড়, ঝিলিক, ঢিল, ঢেলা, ডেলা, বাদুড়, গাদা, পাল, পালটা, বাখারি, চিত, চাটাই, ছাঁচ, ডাক, গুমোট, ভরসা, ডাব, বোমা, ঝাড়, খড়, কুলা, ডাগর, খেয়া প্রভৃতি।

একই সঙ্গে ধেই ধেই, হাঁস ফাঁস, লটপট, মিটি মিটি প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দগুলোও খাঁটি দেশি শব্দ। ভাবপ্রকাশের নিখুঁত মাধ্যম হিসেবে এই শব্দগুলোর জুড়ি মেলা ভার।

২. তৎসম শব্দ

এরপরেই বলতে হয় সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অভিন্ন রূপে যে শব্দগুলি প্রচলিত তাদের কথা। এই শব্দগুলির নাম দেওয়া হয়েছে তৎসম শব্দ। এখানে 'তদ্' বা 'সে' বলতে সংস্কৃত ভাষা আর 'সম' বলতে সমান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে তাদেরকেই তৎসম শব্দ বলব। আগেই বলেছি বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রচুর, আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট হাজার। তৎসম শব্দ ছাড়া বাংলা ভাষা কল্পনা করাই মুশকিল।

মাতা, বন্ধু, বৎস, সন্তান, স্নেহ, আকাশ, পর্বত, নূতন, সঞ্চয়, পথ, বণিক, প্রশ্ন, ভৃত্য, জল, রাত্রি, নদী, গ্রাম, বর্ষা, নৌকা, বৃক্ষ, বন, পত্র, দিক, ভূমি, সভা, ঋণ, স্ত্রী, ব্যক্তি, ছাত্র, শিক্ষা, সাগর, মানব, বজ্র, মধু, বৎসর, ভক্তি, প্রান্ত, স্থল প্রভৃতি।

৩. তদ্ভব শব্দ

তৎসম শব্দের পরেই সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে থাকবে তদ্ভব শব্দ। এখানেও 'তদ্' মানে সংস্কৃত আর 'ভব' শব্দের মানে জাত বা জন্ম নিয়েছে এমন। সুতরাং, যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ দীর্ঘসময় ধরে ভাষাগত বিবর্তনের পথে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি স্তরগুলির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান নিয়েছে, সেগুলিকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

(সংস্কৃত)	>	(প্রাকৃত)	>	(বাংলা)
গাত্র	>	গাত্ত	>	গা
হস্ত	>	হত্থ	>	হাত
মৎস্য	>	মচ্ছ	>	মাছ
চন্দ্র	>	চন্দ	>	চাঁদ

কোথাও দেখছি ধ্বনি লোপ পাচ্ছে। কোথাও আবার ব্যঞ্জন সংগতি বা সমীভবন হচ্ছে দেখছি। অন্য ধ্বনির আগমন-ও দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। ধ্বনি পরিবর্তনের এমনই নানা পর্বের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতভাষার স্তর পেরিয়ে তদ্ভব শব্দগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

এইরকম আরো কিছু নমুনা দিই—

ভক্ত > ভত্ত > ভাত

কাষ্ঠ > কট্ঠ > কাঠ

কার্য > কজ্জ > কাজ

ঘাত > ঘাঅ > ঘা

বঙ্ক > বংক > বাঁক

মাতৃকা > মাইআ >মেয়ে

দুগ্ধ > দুধ্ধ > দুধ

স্বর্ণ > সোন্ন > সোনা

খাদ্য > খজ্জ > খাজা

ভ্রান্ত > ভুল্ল > ভুল

উষ্ট্র > উট্ট > উট

তিক্ত > তিত > তেতো

পাষাণ > পাহাণ > পাহাড়

ঘটিকা > ঘডিআ > ঘড়ি

ঘাট > ঘাড > ঘাড়

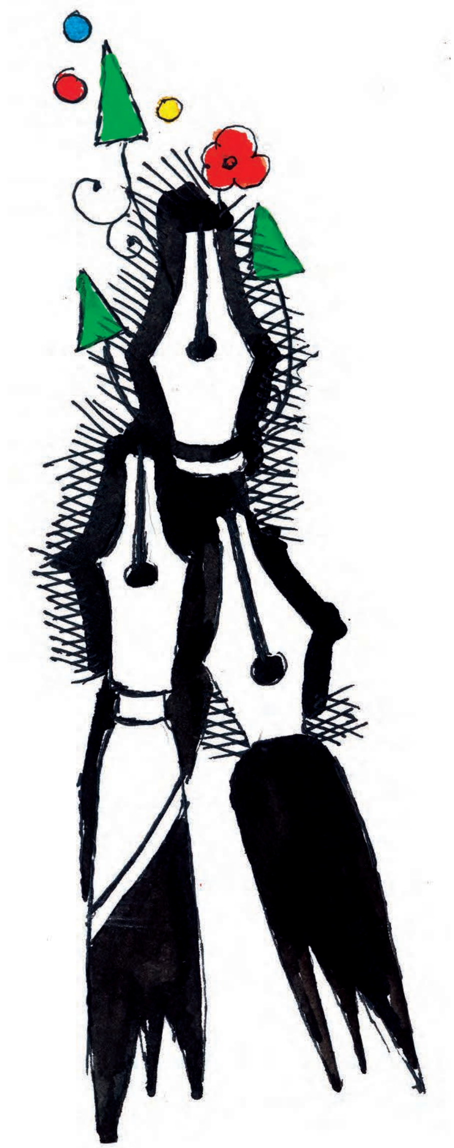

নিম্বু > নিংবু > নেবু

ধর্ম > ধম্ম > ধাম

অদ্য > অজ্জ > আজ

সন্তার > সংতার > সাঁতার

দীপশলাকা > দীবসল্লঈ > দিয়াশলাই > দেশলাই

লঘুক > লহুঅ > হলুঅ > হালকা

জ্যোৎস্না > জোণ্হা > জোনা

গোবিষ্ঠা > গোইট্ধা > গোইধা > গুঠা > ঘুঁটা

দ্বিপ্রহর > দুপহর > দুপর > দুপুর

ভগিনী > বহিনী > বহিন > বইন > বোন

পিতৃষ্বসা > পিউচ্ছা > পিউসিষা > পিসি

কন্টক > কংটঅ > কাঁট > কাঁটা

কৃষ্ণ > কহ্ন > কাহ্ন > কান্ > কানাই

পত্র > পত্ত > পাত > পাতা

পুত্র > বিট্ট > বিটা > বেটা > ব্যাটা

উচ্চ > ঊংচ > উঁচ > উঁচু

চক্র > চক্ক > চাক > চাকা

বৈবাহিক > বৈআহিঅ > বেহাই > বেয়াই

প্রাকৃতভাষা থেকে জাত বলে তদ্ভব শব্দকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয়। এই শব্দগুলির মধ্যে ভাষা পরিবর্তনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে বলে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ওই শব্দগুলির গুরুত্ব অনেক। সাধারণ তদ্ভব ছাড়া আর একধরনের তদ্ভব শব্দ আছে। এদের বলা যায় রূপান্তরিত তদ্ভব শব্দ। অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় আগত শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে অন্যান্য তদ্ভবের মতোই রূপান্তরিত হয়ে অনেক সময়

বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এইরকম কয়েকটি শব্দের তালিকা দেওয়া যাক —

৩.১ রূপান্তরিত তদ্ভব শব্দ

তামিল — পিল্লৈ— পিল্লিক (সংস্কৃত) > পিলুঅ (প্রাকৃত) > পিলে (বাংলা)

মুটৈ — মুটক (সংস্কৃত) > মুডঅ (প্রাকৃত) > মোট (বাংলা)

গ্রিক — দ্রাখ্‌মে — দ্রম্য (সংস্কৃত) > দম্মে (প্রাকৃত) > দাম (বাংলা)

সুরিংক্‌স্‌ — সুরঙ্গ (সংস্কৃত) > সুড়ঙ্গ (প্রাকৃত) > সুড়ঙ্গ (বাংলা)

পারসিক— মোচিক — মোচিক (সংস্কৃত) > মোচিঅ (প্রাকৃত) > মুচি (বাংলা)

তুর্কি — তুর্ক --- তুরক্ক (সংস্কৃত) > তুরুক (বাংলা)

তিগির --- ঠক্কর (সংস্কৃত) > ঠক্কুর (প্রাকৃত) > ঠাকুর (বাংলা)

পহ্লবী— পোস্ত্ --- পুস্তিকা (সংস্কৃত) > পুত্থিঅ (প্রাকৃত) > পুথি (বাংলা)

৪. অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ

এরপরেই বলতে হয় অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দগুলির কথা। নাম থেকেই বুঝতে পারছ, যে সমস্ত তৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হবার পরেও উচ্চারণ বিকৃতির কারণে রূপ বদলেছে, সেই শব্দগুলিই অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ। তদ্ভব আর অর্ধ-তৎসম শব্দ, উভয়েরই উৎস এক কিন্তু তদ্ভব শব্দের রূপান্তর যেমন বহু শতাব্দীর ধ্বনিতাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তনের

ফল, অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে তা নয়। এই পরিবর্তন আকস্মিক, উচ্চারণ-বিকৃতি-জনিত।

কৃষ্ণ > কেষ্ট

বিষ্ণু > বিষ্টু

প্রত্যয় > পেত্যয়

শ্রীদাম > ছিদাম

শ্রী > ছিরি

বৈদ্য > বদ্দি

স্বস্তি > সোয়াস্তি

বৃহস্পতি > বেস্পতি

রৌদ্র > রোদ্দুর

রাত্রি > রাত্তির

স্বাদ > সোয়াদ

গ্রাম > গেরাম

পথ্য > পথ্যি

গৃহস্থ > গেরস্ত

গৃহিণী > গিন্নি

যজ্ঞ > যজ্ঞি

মিত্র > মিত্তির

পিত্ত > পিত্তি

বিশ্রী > বিচ্ছিরি

মিথ্যা > মিছা

অস্ত্র > অস্তর

মন্ত্র > মন্তর

নিশ্চিন্ত > নিশ্চিন্দি

ঘৃণা > ঘেন্না

প্রণাম > পেন্নাম

চিত্র > চিত্তির

কিছু > কিচ্ছু

রাজপুত্র > রাজপুত্তুর

উৎসৃষ্ট > উচ্ছিষ্ট

মহোৎসব > মোচ্ছব প্রভৃতি

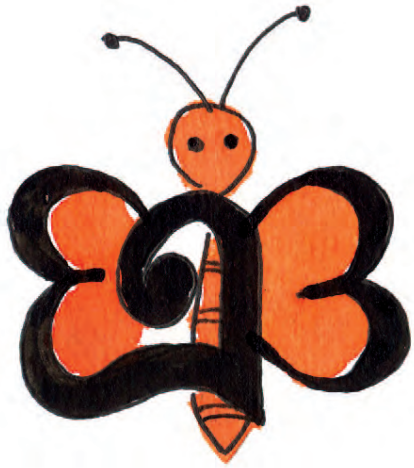

৫.বিদেশাগত বা বিদেশি শব্দ :

এরপর আসা যাক বিদেশাগত বা বিদেশি শব্দগুলির প্রসঙ্গে। আগেই বলেছি, ভাষা একটা জ্যান্ত, বহমান বিষয়। তাই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের কারণে অজস্র আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি,

পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, তুর্কি, চিনা, জাপানি, বর্মি ও রুশ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এই শব্দগুলিকেই আমরা বিদেশাগত শব্দ বলব। তবে মনে রাখতে হবে, আরবি-ফারসি ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রায় হাজার বছরের, আর ইংরেজির সঙ্গেও প্রায় চারশো বছরের। তিনটি ভাষাই ছিল রাজভাষা আর দেশ স্বাধীন হবার পরেও ইংরেজির আপতিক গুরুত্ব বেড়েছে বই কমেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা ছেড়েই দিলাম। স্বাভাবিকভাবেই এই তিনটি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। নমুনা দিলেই বুঝবে, এই শব্দগুলিকে বিদেশি বলে ব্রাত্য করে রাখলে বাংলা ভাষা নিজেই কতখানি দুর্বল হয়ে পড়বে।

আরবি : হাওয়া, বাকি, মতলব, হিসেব, মুকুল, মাফি, শৌখিন, হুঁকা, নবাব, খালি,

জব্দ, আসামি, জিম্মা, তাস, সামিল, মতলব, গরিব, আদায়, জিম্মা, ওয়াকিবহাল, সাহেব, হাজির, রোয়াক, তদারক, জল্লাদ, শয়তান, তুফান, নমাজ, আল্লা, খুদা, মালিক, সাফ, হাল, আইন, আদালত, কেচ্ছা, কয়েদি, শয়তান, খারাপ, জিনিস, নজর, শনাক্ত, কাগজ, তারিখ, দলিল, তাবিজ, কেতাব, ফসল, ফাজিল, বিদায়, সমাজ, জাহাজ, তামাসা, হুকুম, খেতাব ইত্যাদি।

ফারসি : কোমর, হাজার, চেহারা, শিকার, পোশাক, রোজ, খুব, চাকরি, কাকা, বনেদি, বাহার, দরখাস্ত, জানোয়ার, রওনা, বিলেত, ফাঁদ, সাজা, বেচারা, চশমা, রাস্তা, শিশি, সিন্দুক, রুমাল,

সানাই, শরিফ, দালান, কারখানা, নালিশ, কারিগর, দোয়াত, ময়দা, ময়দান, মশলা, শহর, খুশি, মজুরি, দোকান, মরশুম, জামা, মোজা, পেশা, তাজা, খুন, লাল, তোতা, বরফ, দরদ, সবজি, সাদা ইত্যাদি।

ইংরেজি : গভর্নমেন্ট, লাইসেন্স, মাস্টার, লাইব্রেরি, কলেরা, ট্রাম, বাস, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, পকেট, রেলিং, জেটি, হল, ওয়াচ, হিল, স্টেশন, গ্লাস, জেল, সিনেমা, স্কুল, কলেজ, মোটর, রেল, উইল, অফিস, রবার, থিয়েটার, কেরোসিন, ব্যাঙ্ক, লাইন, রিপোর্ট, ফ্রেম, ডাক্তার, ক্লিয়ারিং, বান্ডিল, লিস্ট ইত্যাদি।

ফরাসি : কাফে, কার্তুজ, কুপন, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

পোর্তুগিজ : পিস্তল, আলপিন, চাবি, কামরা, বোতল, পেয়ারা, সাগু, নোনা, আতা, পেঁপে, কামিজ, আলকাতরা, বোতাম, আনারস, মিস্ত্রি, সাবান, তোয়ালে, ফিতা, গামলা, বালতি, পেরেক, জানালা, গরাদ, কেরানি, ক্রুশ, বারান্দা, নিলাম, আলমারি (Armario), মাইরি (Maria) ইত্যাদি।

ওলন্দাজ : ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্ক্রুপ ইত্যাদি।

তুর্কি : বাবা, বন্দুক, বোম, বারুদ, বিবি, বাহাদুর, কুলি, বোনকা, উর্দু, উজবুক,

আলখাল্লা, রোয়াক, কাঁচি, চাকু, দারোগা, লাশ ইত্যাদি।

চিনা : চা, চিনি, লিচু, লুচি ইত্যাদি।

জাপানি : রিকশা, হাসনুহানা, হারিকিরি, সুডোকু, সুনামি, মাঙগা, জেন ইত্যাদি।

বর্মি : লুঙ্গি, ঘুঘনি ইত্যাদি।

রুশ : বলশেভিক, সোভিয়েত, স্পুটনিক ইত্যাদি।

পেরু : কুইনিন ইত্যাদি।

ইতালীয় : ম্যাজেন্টা ইত্যাদি।

অস্ট্রেলীয় : ক্যাঙগারু, বুমেরাং ইত্যাদি।

তিব্বতি : লামা ইত্যাদি।

মিশরীয় : মিছরি, ফ্যারাও ইত্যাদি।

স্পেনীয় : তামাক ইত্যাদি।

৬ . বাংলা-ভিন্ন ভারতীয় শব্দ বা প্রাদেশিক শব্দ

বিদেশি ভাষার মতোই অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও অনেক শব্দ বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে। এই শব্দগুলোকে বলা যেতে পারে বাংলা-ভিন্ন ভারতীয় শব্দ অথবা প্রাদেশিক শব্দ।

হিন্দি : পয়লা, দোসরা, তেসরা, জোয়ার, ঝান্ডা, কুয়াশা, গুজব, ফের, তবু, থানা, চুড়িদার, ধকল, চোট, ভোর, কচুরি, চিঠি, ঢের, জুতা, দাঙগা, পাঠান, ফিরি, ঠিকানা, ঠাহর ইত্যাদি।

গুজরাটি : তকলি, হরতাল ইত্যাদি।

মরাঠি : চৌথ, বর্গি ইত্যাদি।

পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।

তামিল : চুরুট, ভিটা ইত্যাদি।

মুণ্ডারি : থলি, ফর্সা, ময়ূর ইত্যাদি।

তেলেগু : পিলে [ছেলেপিলে < (পিললা)] ইত্যাদি।

সাঁওতালি : কম্বল ইত্যাদি।

ওরাওঁ : খোকা ইত্যাদি।

৭.মিশ্রশব্দ

প্রায় সবরকমের শব্দ সম্বন্ধেই কথা হলো। আর এক ধরনের শব্দের কথা বললেই শব্দভাণ্ডারের মূল শ্রেণিগুলোকে এই আলোচনার আওতায় এনে ফেলা যাবে। এগুলি হলো সংকর বা মিশ্র শব্দ। তৎসম, তদ্ভব, দেশি বা বিদেশি শব্দের মধ্যে যে-কোনো এক শ্রেণির শব্দের সঙ্গে অপর শ্রেণির শব্দ বা প্রত্যয় ইত্যাদির যোগে তৈরি যে-সব নতুন শব্দ, তাদেরকেই বলা হয় সংকর শব্দ অথবা মিশ্রশব্দ।

তৎসম + তদ্ভব —

আকাশগাঙ [গাঙ < গঙ্গা]

বনচাঁড়াল [চাঁড়াল < চণ্ডাল] ইত্যাদি।

তদ্ভব + তৎসম —

কাজললতা [কজ্জল > কাজল]

আলোপাথার [আলোক > আলো] ইত্যাদি।

তৎসম + দেশি — জলঢাকা ইত্যাদি।

তৎসম + বিদেশি — জলহাওয়া ইত্যাদি।

তদ্ভব + বিদেশি — হাটবাজার

জলাজমি

কাজকারবার

জামাইবাবু

শাকসবজি ইত্যাদি।

বিদেশি + তদ্ভব — মাস্টারমশাই
ডাক্তার-বদ্যি
পাউরুটি
অফিসপাড়া
রেলগাড়ি
হাফছুটি
আইনসঙ্গত ইত্যাদি।

বিদেশি + বিদেশি—উকিল-ব্যারিস্টার
হেডমিস্ত্রি
কোর্টকাছারি
হেডমৌলবি
পুলিশসাহেব ইত্যাদি।

বিদেশি প্রত্যয়যুক্ত
মিশ্র শব্দ — পণ্ডিতগিরি
চড়নদার

বাড়িওয়ালা

দারোয়ান

বাবুয়ানা

ঘুষখোর

চালবাজ

বাজিকর

কাতরানি

নস্যদান

ঘরানা

ডাক্তারখানা ইত্যাদি

বিদেশি উপসর্গযুক্ত
মিশ্র শব্দ — বেকসুর

বেহদ্দ

হরেক

বেহাত

গরমিল

গরহাজির ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারের আলোচনা সাঙ্গ হলো। তবে দু- ধরনের শব্দের কথা এখনও বলা প্রয়োজন। প্রথম ধরনটিকে বলা হয় ইতর শব্দ। মার্জিত লোকের কথায় এই ধরনের শব্দ প্রত্যাশিত নয় বলেই এমন নাম দেওয়া হয়েছে। এইরকম কিছু শব্দের মধ্যে পড়বে 'গুল মারা', 'পাঁদানো', 'গেঁজানো' প্রভৃতি শব্দ। এইসব শব্দের উদ্ভব কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সৃজনপ্রতিভা থেকে। কালক্রমে এইসব শব্দের কিছু এমনকী সাহিত্যিক ভাষারও অন্তর্গত হয়ে পড়তে পারে, কিছু যায় অপ্রচলনের অন্ধকারে হারিয়ে। 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' — বইটিতে এই ভাষার চমৎকার নিদর্শন পাবে।

আর দ্বিতীয় ধরনের শব্দ তো আমরা হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। যেমন, ফোন [< টেলিফোন], বাইক [< বাইসাইকেল], মাইক [< মাইক্রোফোন] ইত্যাদি। শব্দের বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে উচ্চারণ করা হয় বলেই এগুলির নাম খণ্ডিত শব্দ।

তবে 'টিভি' কিন্তু খণ্ডিত শব্দ নয়। 'টেলি'-র টি আর 'ভিশন'-এর ভি নিয়ে হয়েছে টিভি। যেমন হেড মাস্টার হয়ে যায় এইচ এম, ভেরি ইম্পর্টান্ট পার্সন হয়ে যায় ভিআইপি, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন হয়ে যায় বিবিসি। ইংরেজিতে একে বলে অ্যাব্রিভিয়েশন (abbreviation), বাংলায় সুকুমার সেন নামে একজন পণ্ডিত এইরকম শব্দের নাম দিয়েছেন মুণ্ডমাল শব্দ।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হলো। শেষবারের মতো মূল সূত্রগুলো একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক—

- বিভিন্ন সময়ে নানা উৎস থেকে শব্দ এসে মিশেছে আমাদের ভাষায়।
- বিভিন্ন উৎস থেকে আসা শব্দগুলি আবার মিলেমিশে নতুন শব্দও তৈরি করেছে।
- এভাবেই ভাষার শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বেড়েছে। বেড়েছে ভাবপ্রকাশের আর অর্থবহনের ক্ষমতা।
- আর সেই কারণেই অন্য ভাষার থেকে ঋণের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি লজ্জা বা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।
- কেননা একটি ভাষার জ্যান্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় এইভাবেই।

হাতেকলমে

১.দৃষ্টান্তসহ কাকে বলে লেখো :

১.১ তদ্ভব শব্দ

১.২ সংকর শব্দ

১.৩ প্রাকৃতজ শব্দ

১.৪ খাঁটি বাংলা শব্দ

১.৫ বিদেশাগত শব্দ

১.৬ ভগ্ন তৎসম শব্দ

১.৭ দেশি শব্দ

২.উদাহরণসহ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

৩.সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলা যায় কি না, বিচার করো।

৪.তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৫.বাংলা ভাষায় বহু ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশি শব্দ এবং তাদের উৎস উল্লেখ করো।

৬.নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির নিম্নরেখাচিহ্নিত শব্দের উৎস নির্ণয় করো :

৬.১ তুমি একটা স্পাই।

৬.২ ইমারত তৈরি করা কত সোজা।

৬.৩ সুযোগ পেলেই মাটিতে হাত লাগিয়ে ছানাছানি করতাম।

৬.৪ মা বলবে, ঠ্যাং দুটো কী কুচ্ছিৎ।

৬.৫ এই তুফানেতে কেউ গাঙ্ পাড়ি দিও না।

৭.টীকা লেখো :

৭.১ খণ্ডিত শব্দ, ৭.২ ইতর শব্দ,

৭.৩ মুণ্ডমাল শব্দ।

৮.শূন্যস্থান পূরণ করো :

৮.১ ____ > তিত > তেতো

৮.২ মৎস্য > ____ > মাছ

৮.৩ খাদ্য > খজ্জ > ____

৮.৪ রাজপুত্র > ____ > রাজপুত

৮.৫ ____ > অজ্জ > আজ

৯.কোনটি কোন শ্রেণির শব্দ নির্ণয় করো :

দুপুর	চন্দ্র	আগল
জামিন	রাজপুত্তুর	চাকা
শহর	খোকা	আলমারি
ঝিঙে	ফুল	মুকুল
পেত্যয়	রৌদ্র	ঝান্ডা

ডাক্তারখানা	ছা	পেরেক
স্টিমার	ফোন	গছানো
কলম	বেকসুর	বৃক্ষ
কাঠ	পিলে	অনাছিষ্টি
কেষ্ট		

১০. সংকর বা মিশ্র শব্দগুলির উৎস নির্ণয় করো :

একটি করে দেওয়া হলো,

'জাহাজঘাট' [আরবি + তদ্ভব]

ফেরিওয়ালা	পদ্মপুকুর	ফুলমোজা
পাহাড়পর্বত	বেকসুর	হেডমিস্ত্রি

শাকসবজি	হাটবাজার	কোর্টকাছারি
মাঝরাত্রি	বন্দুকপিস্তল	কাজকারবার
জলাজমি	বেতার	ঘরানা
পণ্ডিতগিরি	বাজিকর	মাস্টারমশাই
পাউরুটি	খ্রিস্টাব্দ	

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা বানান

বাংলা ভাষায় লিখতে গিয়ে বাংলা বানান নিয়ে সমস্যায় পড়েননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তোমরাও নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে শ/স/ষ কিংবা ন/ণ বা ই/ঈ বা উ/ঊ নিয়ে খুবই বিপদে পড়ে যাও ! মনে হয়, কী অযৌক্তিক আর অকারণ জটিলতা ! এটা ঠিক যে ব্যাপারটা জটিল, কিন্তু অযৌক্তিক নয়। কেন 'ন' এর জায়গায় ণ হয়; শ, স, ষ এর মধ্যে কোনটা কখন হয়; কখন ই বা উ, আর কখনই বা ঈ বা

ঊ হয় — এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আছে যুক্তি। সেইসব যুক্তির কয়েকটা তোমাদের কাছে বলব। তবে তার আগে বলি, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা বাংলা ভাষার জন্ম ও বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যেই। যেহেতু বাংলা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও অন্যান্য ভাষার প্রচুর শব্দ আছে, তাই বাংলা ব্যাকরণের নিয়মের সঙ্গে মেনে চলতে হয় অন্যান্য ভাষার নিয়মও। আগের অধ্যায়ে এ বিষয়ে তোমাদের একটা ধারণা হয়েছে। যাই হোক, বাংলা বানান নিয়ে যুক্তি তর্ক আজও চলছে, কিন্তু সে সব এড়িয়ে তোমাদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি নিয়মের কথা বলছি।

সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে যেসব শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে, সেইসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হলেও

সেই সব শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণের রূপটি কিন্তু গৃহীত হয়নি। যেমন বাংলায় ‘বৃক্ষ’ শব্দের উচ্চারণ হয় ‘ব্রিক্‌খো’, অথচ সংস্কৃত উচ্চারণরীতি অনুযায়ী তা হবে ‘বৃক্‌ষ’। অর্থাৎ ‘বৃক্ষ’ শব্দটি তৎসম শব্দ হিসেবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হলেও, উচ্চারণের ক্ষেত্রে তা বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ- রীতি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে সংস্কৃত উচ্চারণরীতি ও বাংলা উচ্চারণরীতির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন সংস্কৃত উচ্চারণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদ আছে। অর্থাৎ ‘ই’ এবং ‘ঈ’ বা ‘উ’ এবং ‘ঊ’ উচ্চারণ এক নয়। কিন্তু বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদ নেই, ‘ই’ এবং ‘ঈ’ কিংবা ‘উ’ এবং ‘ঊ’ উচ্চারণ একই। ‘নদী’-র ‘ঈ’-এর উচ্চারণ এবং ‘যদি’-র ‘ই’ উচ্চারণ বাংলায় একই। একইভাবে ‘ঋ’/

‘ঋ-কারের’ উচ্চারণ বাংলায় ‘রি’/র-ফলার মতো হয়ে যায়।

কিন্তু উচ্চারণের সঙ্গে যেহেতু ‘বানান’ বহুক্ষেত্রেই সম্পর্কিত নয়, তাই বানানের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ীই হবে। অর্থাৎ ‘নদী’ শব্দে কখনওই হ্রস্ব- ই-কার হবে না, দীর্ঘ-ই-কারই হবে।

তবে সংস্কৃত ব্যাকরণেই বহু শব্দের বিকল্প বানান আছে। বাংলাভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বিকল্প বানানের মধ্যে থেকে গ্রহণ করার সুযোগ আছে। যেমন, ‘ধমনি’ ও ‘ধমনী’ দুটি বানানই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত। যেহেতু বাংলা ধ্বনিতে শুধু হ্রস্ব-ই ধ্বনিই সম্ভব, তাই ‘ধমনী’র পরিবর্তে ‘ধমনি’ বানানকে গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত।

যে বিকল্প বানান গ্রহণযোগ্য	যা হবে না
অবনি, ধমনি, শ্রেণি, সরণি, সারণি, রজনি, পদবি, গুণাবলি/ নামাবলি/প্রশ্নাবলি/ (-আবলি) অঙ্গুরি, অঙ্গুলি, কুটির, উষা, উষসী	অবনী, ধমনী, শ্রেণী, সরণী, সারণী, রজনী পদবী, গুণাবলী/ নামাবলী/প্রশ্নাবলী/ (-আবলী) অঙ্গুরী অঙ্গুলী, কুটীর, ঊষা, ঊষসী

সংস্কৃত-ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘ-ই-কারান্ত হয় এবং বাংলায় সেরূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ	কর্তৃকারকে একবচন
অভিমুখিন্	অভিমুখী
আততায়িন্	আততায়ী

ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ	কর্তৃকারকে একবচন
শশিন্	শশী
সহযোগিন্	সহযোগী
মন্ত্রিন্	মন্ত্রী

এই শব্দগুলিই যখন সমাসবদ্ধ হয় বা সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয় তখন শব্দের শেষের 'ঈ' আবার 'ই'-তে পরিণত হয়। যেমন—

শশিন্ > শশী + ভূষণ > শশিভূষণ

মন্ত্রিন্ > মন্ত্রী + সভা > মন্ত্রিসভা

সহযোগিন্ > সহযোগী + তা > সহযোগিতা

কিন্তু এই শব্দগুলোর সঙ্গে যদি অতৎসম প্রত্যয়যুক্ত হয় তাহলে তা যুক্ত হবে বাংলার রূপের সঙ্গে। অর্থাৎ—

মন্ত্রী + গিরি = মন্ত্রীগিরি (‘মন্ত্রিগিরি’ হবে না)

অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরের বদলে হ্রস্ব স্বরের ব্যবহারই সমর্থনযোগ্য। যেমন : হীরা > হিরে, পক্ষী > পাখি, ধূলা > ধুলো।

ধরো, এই দুটো বাক্য— ‘তুমি কি খাবে?’

‘তুমি কী খাবে?’

—এই দুটি বাক্য আপাতদৃষ্টিতে প্রায় একই, শুধু প্রথম বাক্যে আছে ‘কি’ আর পরের বাক্যে আছে ‘কী’। এই পার্থক্যটি ছোটো হলেও এর তাৎপর্য বিরাট। প্রথম প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ - এ হবে, অর্থাৎ ‘সে খাবে’ বা ‘সে খাবে না’। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ নয়, অন্য কিছু হবে, অর্থাৎ সে ভাত বা ডাল ইত্যাদি খাবে। সুতরাং যখন প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না হবে, তখন হবে ‘কি’, আর যখন প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না ছাড়া

অন্যকিছু হবে, তখন হবে 'কী'। এই কারণেই কীভাবে, কীরকম, কী জন্য হবে। এছাড়াও বিস্ময়, আবেগ ইত্যাদি বোঝাতেও ঈ-কার ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন : 'কী দারুণ খেলল ভারত'।

তৎসম শব্দের শেষের বিসর্গ উচ্চারিত হয় না বলে, সংস্কৃত '—তস্' বা '—শস্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে বিসর্গ কালক্রমে বর্জিত হয়ে গেছে। যেমন : ক্রমশঃ, ফলতঃ, সর্বতঃ এই শব্দগুলো বিসর্গ ছাড়াই লেখা হয়। এর ফলে অহঃ + অহঃ = অহরহ, (অহরহঃ হবে না), ইতঃ + ততঃ = ইতস্তত (ইতস্ততঃ হবে না)।

কিন্তু বিসর্গ সন্ধির ক্ষেত্রে প্রথম শব্দের শেষের বিসর্গটি সন্ধিবদ্ধ হলেও যদি অবিকৃত থাকে, বাংলা বানানে সেই বিসর্গটি থাকবে। যেমন—

বয়ঃ + সন্ধি = বয়ঃসন্ধি

অধঃ + পাত = অধঃপাত

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় ‘ঙ’-এর বদলে ‘ং’ ব্যবহার। ‘ঙ’ থাকলেই তার জায়গায় ‘ং’ ব্যবহৃত হবে, এরকমটা নয় মোটেও। তৎসম শব্দে সন্ধির কারণে পূর্বপদের শেষে ‘ম্’ থাকলে তার জায়গায় ‘ঙ’ বা ‘ং’ হয়। যেমন— অহম্ + কার = অহংকার, অহঙ্কার। কিন্তু যেখানে সন্ধির ফলে ‘ম’-এর জায়গায় ‘ং’ আসেনি, সেখানে ‘ং’ হবে না। যেমন— অন্‌ক্ + অল > অঙ্ক (অংক হবে না)। একইভাবে আকাঙ্ক্ষা (আকাংখা নয়), আতঙ্ক (আতংক নয়), বঙ্গ (বংগ নয়), সঙ্গ (সংগ নয়) ইত্যাদি।

আবার ‘ম্’-এর পর বর্গীয় ‘ব’ থাকলে তা ‘ম্’-ই হবে ‘ং’ হবে না। যেমন : সম্ + বোধন = সম্বোধন (সংবোধন নয়)।

কিন্তু যদি বর্গীয় 'ব' না হয়ে অন্তঃস্থ 'ব' হয় তাহলে 'ং' হবে।

যেমন : কিংবদন্তী, প্রিয়ংবদা।

রেফ ব্যবহার করলে পরবর্তী ব্যঞ্জন নিয়ে অনেকক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা যায়। অর্থাৎ 'অর্জ্জন' না 'অর্জন', 'কর্ম' না 'কর্ম্ম', 'অর্ঘ' না 'অর্ঘ্য' 'সূর্য' না 'সূর্য্য'।

এব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে রেফ-এর পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটবে না। সুতরাং অর্জন, কর্ম হবে।

কিন্তু অর্ঘ্য/অর্ঘ আর সূর্য/সূর্য্য -এর ক্ষেত্রে কী হবে?

অর্ঘ্য = অ + র্ + ঘ্ + য্ + অ। দেখা যাচ্ছে যে এখানে দ্বিত্ব ঘটেনি।

সুতরাং 'অর্ঘ্য' ঠিক।

সূর্য্য = স্ + ঊ + র্ + য্ + য্ + অ। এখানে 'য্' ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটেছে।

সুতরাং একটি 'য্' বর্জনীয়, হবে 'সূর্য'।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোথায় 'ণ' হবে, কোথায় হবে 'ষ'।

প্রথমে আসি 'ণ' বিষয়ে :

- ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরের শব্দের মধ্যে ন > ণ হয়। ঋণ, বর্ণ, ঘৃণা, স্বর্ণ, তৃণ, জীর্ণ, সহিষ্ণু ইত্যাদি। এই কারণেই প্র, পরা, পরি ও নির্ এই চারটি উপসর্গের পরে ণ হয়। পরায়ণ, প্রণাম, নির্ণয়, পরিণাম।
- ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ এবং ং ব্যবধান থাকলে ণ হয়। কৃপণ, হরিণ, পাষাণ, গ্রহণ।

কিন্তু উল্লিখিত বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকলে ন হয়। যথা— দর্শন, অর্চনা, রচনা, প্রার্থনা ইত্যাদি।

- ট্, ড্, ঢ্-র সঙ্গে ণ হয়; খেয়াল করলে দেখা যাবে এ-সব ধ্বনি ট-বর্গের অন্তর্গত অর্থাৎ মূর্ধন্য ধ্বনি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মূর্ধন্য ণ হয়। ঘণ্টা, দণ্ড, পণ্ডিত, কণ্টক, লুণ্ঠন, কণ্ঠ। একই কারণে ত, থ, দ ও ধ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে সবসময় ন হয়। চিন্তা, সন্তান, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা।
- পূর্ব ও অপর শব্দের পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের ন হয়ে যায় ণ। যথা— পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।
- পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নার শব্দের পরবর্তী 'অয়ন' শব্দের ন হয়ে যায় ণ। যথা—পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

● কতকগুলি শব্দের ণ স্বাভাবিক। ভাষাবিদ জ্যোতিভূষণ চাকী এই শব্দগুলিকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছেন, মনে রাখার সুবিধার জন্য। এখানে তার কিছু শব্দ উল্লেখিত হলো—

বাণিজ্য, লাবণ্য, শোণিত,
আপণ, কঙ্কণ, কোণ, গণনা,
গণিত, চাণক্য, তূণ, নিপুণ,
লবণ, বণিক, গুণ, বীণা, কণা,
মণি, পাণি, বাণ, পণ, মাণিক্য,
নৈপুণ্য, গণ্য, ফণী, পুণ্য, গণ।

এবার দেখি কোথায় কোথায় 'ষ' হয় :

● ঋ-কারের পর 'ষ' হয় যেমন— ঋষভ, ঋষি।

● ট ও ঠ-এর আগের শিষধ্বনি 'ষ' হয়। যেমন— নষ্ট, বেষ্টন, সাষ্টাঙ্গ, অনুষ্ঠান।

- অ/আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্-এর পরবর্তী বিভক্তি ও প্রত্যয়ের স হয় ষ। বিষয়, পরিষ্কার, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, শ্রীচরণেষু।

  কিন্তু সাৎ প্রত্যয়ের স ষ হয় না। যেমন—অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ।

- অতি, অধি, অণু, অপি, অভি, নি, পরি, প্রতি, বি, সু এই উপসর্গগুলির পর কতকগুলি ধাতুর স হয় ষ। যেমন---প্রতিষেধ, অভিষেক, নিষেধ, সুষমা, বিষম।

- পিতৃ ও মাতৃ শব্দের সঙ্গে স্বসৃ শব্দের যোগ হলে স্বসৃ শব্দের প্রথম স হয় ষ। যেমন—মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

- কতকগুলি শব্দের ষ স্বাভাবিক। এখানেও এ বিষয়ে ভাষাবিদ জ্যোতিভূষণ চাকীর কবিতা থেকে নেওয়া কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করা হলো—

আষাঢ়, ঈষৎ, উষর, নিকষ,
বিশেষণ, ভাষা, উষা, বিশেষ,
ষোড়শ, বিষাণ, বিষ, পুষ্প,
দোষ, মহিষ, মূষিক, প্রদোষ,
প্রত্যূষ, ভূষণ, ভূষা, শেষ,
বাষ্প, ভাষ্য, পোষ্য, মেষ।

এই ণত্ব বিধি তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ‘ন’ হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন— ঘরানা, চিরুনি, পুরোনো, মানিক, রানি ইত্যাদি। অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য বর্গের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ‘ন’ হবে। যেমন— গন্ডার, মুন্ডা ইত্যাদি। কয়েকটি ব্যতিক্রম অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। যেমন, কুণ্ডু, মুণ্ডু ইত্যাদি।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি, জার্মান, পোর্তুগিজ, ফরাসি শব্দ আছে,

সেগুলির ক্ষেত্রে হ্রস্বস্বরচিহ্ন ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। যেমন কিডনি, জার্মানি (জার্মানী নয়), ইভ (ঈভ নয়), গির্জা (গীর্জা নয়) ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে 'ণ'-এর ব্যবহার না করে 'ন' এর ব্যবহারই কাম্য। যেন—ইরান, কনসার্ন ইত্যাদি। একইভাবে 'ষ'-এর ব্যবহারও বর্জনীয়। উচ্চারণ অনুযায়ী 'শ্' বা 'স' -এর ব্যবহার হবে। ইংরেজিতে st-র জায়গায় বাংলা 'স্ট' , s -এর জায়গায় 'স' এবং sh -র জায়গায় 'শ' -এর ব্যবহারই প্রচলিত।

বিদেশি নামের ক্ষেত্রেই হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন—শেলি, কিটস, শেক্সপিয়র ইত্যাদি।

বাঙালি পদবির ইংরেজি ধরনের উচ্চারণেও হ্রস্বস্বরচিহ্ন হবে, যেমন—ব্যানার্জি (ব্যানার্জী নয়), গাঙ্গুলি (গাঙ্গুলী নয়) ইত্যাদি। স্থান নাম

যদি অতৎসম শব্দ হয় সেক্ষেত্রেও হ্রস্বস্বর, ‘ন’ ব্যবহৃত হবে। যেমন, দিঘা (দীঘা নয়), রানাঘাট (রাণাঘাট নয়) ইত্যাদি।

হাতে কলমে

১.নীচের শব্দগুলির বানানে কোনো অসঙ্গতি থাকলে যথোপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সংশোধন করো :

আততায়ি, কালীদাস, মন্ত্রিপনা, বয়োসন্ধি, অংক, প্রিয়ম্বদা, বর্জ্জন, মহার্ঘভাতা, মানিক্য, প্রার্থনা, দণ্ড, মধ্যাহ্ন, নারায়ন, ধূলিষাৎ, অভিশেক, ষোরশ, পুরষ্কার, জার্ম্মানী, ধূলো, পাখী।

২.নীচের বাক্যগুলিতে কোন শব্দের বানান কেন অশুদ্ধ, নির্ণয় করো :

২.১ তুমি কি দেশের এই দূর্দিনে চুপ করে বসে থাকবে?

২.২ আষাড়ের কোন ভেজা পথে এল আমার দুরন্ত শ্রাবন।

২.৩ অপরাহ্নে পণ্ডিতমশাই সংস্কৃতের ক্লাশ নেবেন।

২.৪ শিশু শশি নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার।

২.৫ কি কাণ্ড ! অবনী বস্তুতঃ কোনো সহযোগীতাই করেনি।

৩.নীচের অনুচ্ছেদগুলি থেকে অশুদ্ধ বানানের শব্দগুলি চিহ্নিত ও সংশোধন করে লেখো :

৩.১ মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহাদিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে

দেবামাত্র, যে-বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাধে। জড়ের তো বাইরের সত্তার সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই, মানুষের আছে। তার বাইরের প্রাণ, অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে।

৩.২ পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়। সেটাতে চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল থেকে তার ই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিনি। ধরনীর ধনভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্য্যের অমৃত। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র নিমন্ত্রনের সৌহার্দের ডাক।

৩.৩ আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারম্বার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না। যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীর জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।

৩.৪ একদিন মানুষ ছিল বুনো। ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটতে পারত না — ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটত। কি সুন্দর তার ভংগী, কি অবাধ তার স্বাধীনতা। ঘোড়ার সর্বাংগে যে একটি ছোটবার আনন্দ দ্রুততালে নৃত্য করত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা লোভ হলো।

তৃতীয় অধ্যায়

নানারকম শব্দ

শব্দ কী, তোমরা জানো। বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে তৈরি, যার নির্দিষ্ট অর্থ থাকে যা বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে শব্দ বলে।

যেমন : বাড়ি, পাখি, হাত, পা, মা, গায়ক, মৃন্ময় ইত্যাদি শব্দ। এগুলির প্রত্যেকটি বর্ণ দিয়ে তৈরি এবং প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে।

এই শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে

পদ বলে। এখানে পদ নয়, আমরা আলোচনা করব শুধু শব্দ নিয়ে।

প্রথমে কয়েকটি শব্দ ও তাদের অর্থের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যেমন : স্মরণীয়, হরিণ, পঙ্কজ। এই তিনটি শব্দের প্রথমটি অর্থাৎ স্মরণীয় শব্দটির অর্থ (স্মৃ + অনীয় অর্থাৎ) যা মনে রাখার মতো। শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থই এর অর্থ হিসেবে স্বীকৃত। হরিণ শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ হলো যে হরণ করে। কিন্তু সেই অর্থে আমরা 'হরিণ' শব্দ ব্যহার করি না। হরিণ বলতে একটি বিশেষ প্রাণীকেই বোঝায়। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে এই অর্থের কোনো যোগ নেই। অন্যদিকে পঙ্কজ শব্দের অর্থ পঙ্কে জন্মায় যা। অথচ পঙ্কজ বলতে আমরা 'পদ্ম' বুঝি। 'পদ্ম' পঙ্কে জন্মায় যেমন, তেমনি শ্যাওলা, কেঁচো, পাঁকাল প্রভৃতিও পঙ্কে জন্মায়।

কিন্তু ‘পঙ্কজ’ বলতে এ সব না বুঝিয়ে শুধু ‘পদ্ম’ বোঝায়। এক্ষেত্রে ‘পঙ্কজ’ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের যোগ আছে, কিন্তু অনেকগুলি সম্ভাব্য অর্থের মধ্যে একটি অর্থই প্রচলিত হয়। অর্থের এই বৈচিত্র্যের দিক থেকেই শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

প্রথম উদাহরণটি, অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থ থেকেই পাওয়া যায়, তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন : স্মরণীয়, গায়ক ইত্যাদি।

যে শব্দের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা প্রকৃতি প্রত্যয়জাত অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই তাকে রূঢ় শব্দ বলে। যেমন—হরিণ, মণ্ডপ, প্রবীণ ইত্যাদি।

যে শব্দের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা সম্পর্ক থাকলেও, অন্য অর্থগুলির থেকে

একটি অর্থই বিশেষ হয়ে যায়, তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন : পঙ্কজ, বাঁশি ইত্যাদি।

সুতরাং শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিভাগটি হলো :

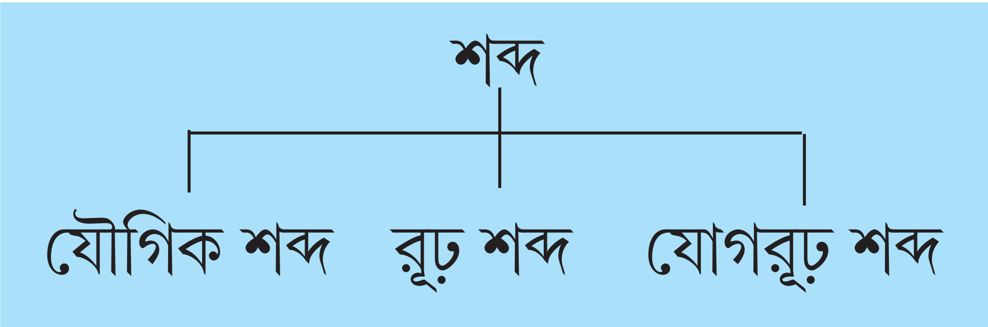

শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

শব্দের গঠনগত ভাগ :

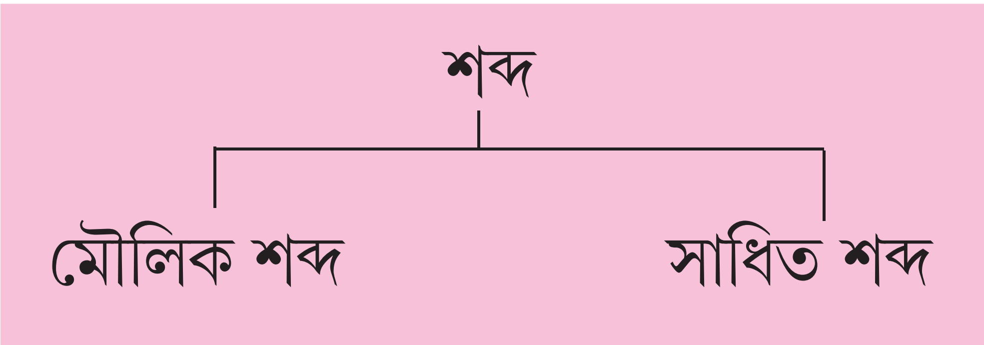

শব্দের এই গঠনগত শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আমরা আলোচনা করব 'শব্দ তৈরির কৌশল' অধ্যায়ে।

শব্দদ্বৈত
ও
ধ্বন্যাত্মক শব্দ

শব্দদ্বৈত

কথা বলার সময় কোনো শব্দকে আমরা অন্য অর্থ দুবার ব্যবহার করি। যদি বলি, ‘আকাশটা লাল হয়ে আছে’— তাহলে বোঝায় যে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের কারণে আকাশে লাল রঙের ছটা লেগেছে। কিন্তু এই ‘আকাশ’ শব্দটাকে দুবার বলি, যেমন, ‘আকাশে আকাশে আজ আনন্দ ছড়িয়ে আছে’ বললে শুধু ‘আকাশ’ বোঝায়, সমগ্র প্রকৃতি পরিবেশ যেন ধরা পড়ে এই বাক্যে। ‘ঘরে ঘরে মৃত্যুর জন্য হাহাকার’ বললে কোনো একটা ঘর যেমন বোঝায় না, তেমনি সব ঘরও বোঝায় না; বোঝায় অনেক ঘর বা পরিবারের দুর্দশার

কথা। একটি বিশেষ শব্দের দুবার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অর্থের ও ভাবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলে, শব্দের এই প্রয়োগকে শব্দদ্বৈত বলে।

শব্দদ্বৈত প্রয়োগের মাধ্যমে নানারকম অর্থের সৃষ্টি হয়। নীচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলো :

- ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খেতে হয়।— নিয়মিত অর্থে
- মিনিটে মিনিটে গোল দিল জার্মানি।— দ্রুত অর্থে
- লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেল।— বহুলতা বোঝাতে
- আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়িয়ে।— বহুলতা বোঝাতে
- গলায় গলায় ভাব।— গভীরতা বোঝাতে

- হাতে হাতে কাজটা এগিয়ে দাও।— সাহায্য অর্থে
- বাচ্চারা চোর-চোর খেলছে।—অনুকরণ অর্থে
- বাড়িটার অবস্থা পড়ো-পড়ো।— আসন্ন অর্থে
- তখন থেকে যাই যাই করছ কেন?— আসন্ন অর্থে

তবে একই শব্দ দুবার ব্যবহার হলে যেমন অর্থ বা ভাবের বৈচিত্র্য সাধন হয়, তেমনি একই ধরনের শব্দ বা সমার্থক, প্রায়-সমার্থক এমনকী বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে যুগ্মশব্দ তৈরি করে শব্দদ্বৈতের মতো প্রয়োগ করা হয়।

যেমন : 'ডাক্তার-বৈদ্য' শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে 'ডাক্তার' ও 'বৈদ্য' সমার্থক। এইরকম দুই সমার্থক

শব্দ দিয়ে তৈরি শব্দদ্বৈত আমরা অনেক সময়েই ব্যবহার করি। ‘এখানে কোনো ডাক্তার-বৈদ্য নেই।’

একইভাবে :

- এখানকার বাড়িঘর দেখলে মনে হয় পাড়াটা প্রাচীন।
- মাঠেময়দানে এখন শুধুই বিশ্বকাপ ফুটবলের আমেজ।
- বয়স হচ্ছে, একটু ঠাকুরদেবতার কথা ভাবো।

আবার একেবারে সমার্থক না হলেও দুটি প্রায় সমার্থক শব্দ দিয়েও শব্দদ্বৈত তৈরি করা হয়। যেমন ‘হাসা’ বা ‘খেলা’ সমার্থক শব্দ নয়, কিন্তু দুটির মধ্যে আনন্দের যোগ আছে। তাই

‘হাসিখেলা’ বা ‘হেসেখেলে’ আমাদের ভাষার অত্যন্ত পরিচিত শব্দদ্বৈত।

উদাহরণ :

- জীবনটা হেসেখেলে কেটে গেলেই হলো।
- রেখে ঢেকে কথা বলো না।
- ধারে কাছে কোনো বাজার আছে নাকি?

সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক নয়, একেবারে বিপরীত অর্থ বহনকারী দুটি শব্দ মিশে গিয়েও শব্দদ্বৈতের সৃষ্টি হয়। আমাদের কথায় এধরনের শব্দদ্বৈতের ব্যবহার প্রচুর। যেমন— ভালোমন্দ, হাসিকান্না, শত্রুমিত্র, ভূতভবিষ্যৎ, যাওয়াআসা, অল্পবিস্তর ইত্যাদি।

- আজ রাতের খাওয়ায় ভালোমন্দ জুটবে মনে হচ্ছে।
- যাওয়াআসাই হচ্ছে, কাজের কাজ হচ্ছে না।

আরেক রকমের শব্দদ্বৈত আমরা পাই, যেখানে কোনো শব্দের ছায়ায় বা সেই শব্দের বিকৃতির ফলে আরেকটি অংশের সৃষ্টি হয়। এই বিকৃত বা ছায়া শব্দটির কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থপূর্ণ অংশটির সঙ্গে থেকে অর্থের বৈচিত্র্য ঘটায়। যেমন 'চা-টা'। 'চা' শব্দের অর্থ থাকলেও 'টা' শব্দের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'টা' শব্দটি 'চা'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে, শুধু 'চা' নয়, 'চা' এর সঙ্গে অন্য খাবারের অনুষঙ্গ তৈরি করে। যেমন :

- তোর সঙ্গে তো বিখ্যাত লোকদের আলাপসালাপ আছে।
- বাচ্চারা দুষ্টুমি করে, তার জন্য বকাঝকা করা উচিত নয়।
- সব মাপজোক করা আছে, কাজ শুরু করলেই হয়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

শব্দের মাধ্যমে কোনো বাস্তব আওয়াজ বা ধ্বনিকেও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। আমরা কানে যেমন শুনি, তাকে অনুকরণ করে তার কাছাকাছি কোনো শব্দ দিয়ে সেই ধ্বনিরূপ লিখি। যেমন- **ঢং ঢং** করে ঘণ্টা বাজল। ঘণ্টা বাজার যে আওয়াজ বা ধ্বনি, তাকে অনুকরণ করে এই 'ঢং ঢং' শব্দটা তৈরি হয়েছে।

সুতরাং যে সব শব্দের মাধ্যমে কোনো বাস্তব বা বাহ্যবস্তুর ধ্বনি বা কোনো অনুভূতিগ্রাহ্য কোনো অবস্থার দ্যোতনা ফুটে ওঠে, তাদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। উপরের 'ঢং ঢং' শব্দটি নিঃসন্দেহে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে মনের বিশেষ অনুভূতির কথাও প্রকাশিত হয়; যেমন : ফাঁকা বাড়িতে গা **ছম**

ছম করে। এই ছম ছম শব্দটি মনের একটি বিশেষ অবস্থার কথা বলে। তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি —

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

- অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ
- ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ

অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

সবাই হো হো করে হাসছে।

দুম করে একটা শব্দ হলো।

ঝির ঝির করে বাতাস বইছে।

রাতে দরজায় কে যেন খট খট করে শব্দ করল!

টুং টাং করে পিয়ানো বাজছে।

ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

আচমকা তোমার ছায়া দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে।

রসগোল্লার রস লেগে হাতটা চট চট করছে।

অত বড়ো মাঠটা খাঁ খাঁ করছে।

হাতে কলমে

১.বাক্যে প্রয়োগ করো :

কড়কড়ে, বনবন, গনগন, টুংটাং, খাঁ খাঁ, রান্নাবান্না, ছ্যাঁকছ্যাঁক, হিতাহিত, কথায় কথায়, চোখে চোখে, বারে বারে, রকম-সকম, বইটই, চুপচাপ, ভন্‌ভন্‌, ঝিরঝির, ঝমঝম, দুমদাম, টাপুর-টুপুর, করকর, ঝিনঝিন, খিলখিল, আবোল-তাবোল, মাঝে মাঝে, ঠিক-ঠিক

২.নীচের বাক্যগুলিতে শব্দদ্বৈতগুলির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য দেখাও :

২.১ আজ মুখোমুখি যুদ্ধ।

২.২ ঠেলাঠেলির মধ্যে না যাওয়াই ভালো।

২.৩ চা-টা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে।

২.৪ ধরো ধরো পড়ে যাবে যে !

২.৫ শীত যায় যায় এমন সময়ের ঘটনা।

২.৬ দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এল।

২.৭ মুখে মুখে ছড়াটা শিখে নিয়েছে।

২.৮ কেঁদে কেঁদে আর ঘুরে বেড়িও না।

২.৯ টাকা টাকা করেই জীবনটা কাটালো।

২.১০ বাগানে এখন রাশি রাশি ফুল।

২.১১ এসো-এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল।

২.১২ চলাফেরা দিনদিন কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

৩.নীচের বাক্যগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করো :

৩.১ তাঁর পরনে সেদিন ধব্‌ধবে সাদা কাপড়।

৩.২ কনকনে শীত আমি একদম পছন্দ করি না।

৩.৩ <u>ঘড়্‌ঘড়্‌</u> শব্দটা হয়েই চলেছে।

৩.৪ শুধু <u>অন্ন বস্ত্রের</u> কথা ভাবলে চলে না।

৩.৫ <u>ঘুটঘুটে</u> অন্ধকারে একলা হেঁটে চলেছি।

৩.৬ <u>ঝমঝম</u> করে বৃষ্টি এল।

৩.৭ <u>তর্‌তর্‌</u> করে নৌকো এগিয়ে চলল।

৩.৮ চারিদিক জলে <u>থই থই</u> করছে।

৩.৯ দেখে গা <u>রিরি</u> করে উঠল।

৩.১০ তারারা আকাশে <u>জ্বলজ্বল</u> করছে।

৪.নীচের শব্দগুলি থেকে শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার শব্দ আলাদা করে লেখো :

জানাশোনা, খড়খড়, ফন্দি-ফিকির, বাসন-কোসন, হাসিকান্না, কানাকানি, বনবন, দিনেদিনে, হাঁক-ডাক, সাজ-গোজ, মালপত্র, খাঁ খাঁ, রগরগে, দুমদাম, ধূ ধূ, দপদপ, হনহন, আজেবাজে, কাপড়-চোপড়, থেকে থেকে।

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দ তৈরির কৌশল

আমরা জানি যে বাক্যের মধ্যে থাকে শব্দ আর যদি বলি শব্দের মধ্যে কী থাকে? তোমরা চলবে 'বর্ণ', যেমন 'গন্তব্য' শব্দের মধ্যে গ্ + অ + ন্ + ত্ + অ + ব্ + য্ + অ --- এই বর্ণগুলো এইভাবে পাশাপাশি আছে। ঠিকই, কিন্তু শব্দের গঠন যেমন বর্ণ দিয়ে বা ধ্বনি দিয়ে হয়, তেমনি আরেকভাবে শব্দ তৈরি হতে পারে। 'গন্তব্য', 'গত', 'গম্য'

--- এই শব্দগুলির মধ্যে একটা সাধারণ (Common) দিক আছে, এবং তা হলো 'যাওয়া'। কীভাবে তা দেখাই :

গন্তব্য : যেখানে যাওয়া উচিত

গত : যা গেছে

গম্য : যেখানে যাওয়া যায়

অর্থাৎ এই শব্দগুলির মধ্যে এমন একটা শিকড় আছে যেখান থেকে নানা শাখা বেরিয়েছে :

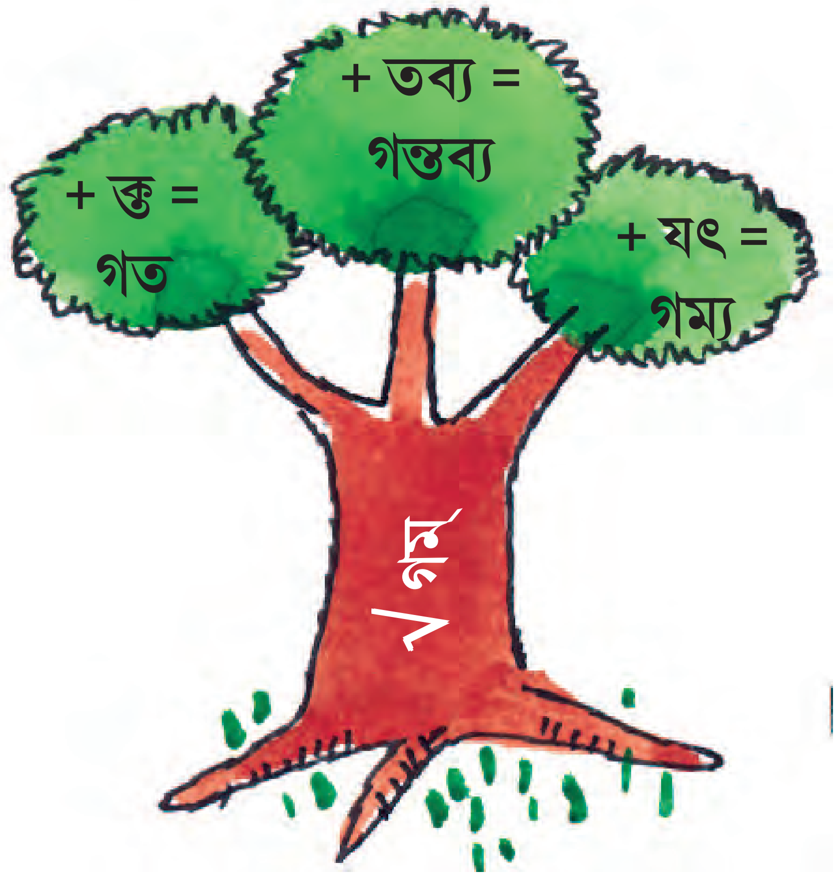

এই শব্দগুলির মধ্যে ‘গম্’ বলে একটা সাধারণ বিষয় আছে, যার সঙ্গে নানা কিছু যুক্ত হয়ে এই শব্দগুলি তৈরি করেছে। শব্দতৈরির এই কৌশলই আমরা এবার শিখে নেব।

অর্থগত দিক থেকে কতরকমের শব্দ হয় তোমরা জানো। গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দকে দুভাগে ভাগ করা যায় :

শব্দ

মৌলিক — সাধিত

মৌলিক শব্দ হলো, যে শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন বাবা, মা, হাত ইত্যাদি। আর সাধিত শব্দ হলো যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন — করা (কর্ + আ), পাগলাটে (পাগলা + টে) গুণপনা (গুণ + পনা) ইত্যাদি। সুতরাং এই সব আলোচনা আর উদাহরণ দেখে বুঝতে

পারছ যে শব্দ তৈরি বলতে আমরা সাধিত শব্দের কথাই বলছি।

প্রথমেই বলি সাধিত শব্দের মধ্যে সাধারণত দু-ধরনের শিকড় থাকে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই শিকড়কে বলা হয় ধাতু প্রকৃতি (যেমন, 'গম্' একটি ধাতু)। আর ক্রিয়া ছাড়া অন্য ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে তার নাম হলো শব্দ-প্রকৃতি।

এই ধাতু-প্রকৃতি বা শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে যা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন আগের উদাহরণগুলিতে তা দেখেছ। তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি—

গম্	+	তব্য	=	গন্তব্য
গম্	+	ক্ত	=	গত
গম্	+	যৎ	=	গম্য
ধাতু-প্রকৃতি	+	প্রত্যয়	=	গঠিত শব্দ

আবার

ভূগোল	+	ষ্ণিক	=	ভৌগোলিক
শব্দ - প্রকৃতি	+	প্রত্যয়	=	গঠিত শব্দ

তাহলে ‘প্রত্যয়’ যুক্ত হয় কখনো ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে, কখনো বা শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে। এই দিক থেকে প্রত্যয়েরও দুটো ভাগ আছে :

প্রত্যয়

- কৃৎ-প্রত্যয় (যা যুক্ত হয় ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে)
  - সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়
  - বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়
- তদ্ধিত-প্রত্যয় (যা যুক্ত হয় শব্দ প্রকৃতির সঙ্গে)
  - সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
  - বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে প্রত্যয়যুক্ত হলে প্রত্যয়ের চেহারা পালটে যায়। এই বিষয়টিকে আমরা একটা কারখানার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই কারখানাকে শব্দ তৈরির কারখানাও বলতে পারো :

এই কারখানার কাঁচামাল হলো ‘গম্’ ধাতু আর ‘যৎ’ প্রত্যয়। যখন শব্দ তৈরি হলো তখন ‘যৎ’ প্রত্যয়ের ‘ৎ’ অংশটি নষ্ট হয়ে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল, আর ‘য’ যুক্ত হয়ে গেল ‘গম্’ - এর সঙ্গে।

শেষপর্যন্ত তৈরি হলো 'গম্য' শব্দটি। ব্যাকরণে এই নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বলে 'ইৎ'।

ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যখন প্রত্যয় যুক্ত হয় তখন শব্দের মধ্যে স্বরের পরিবর্তন ঘটে। যেমন:

(১) √লিখ্ + অনট = লিখন, √কৃ + অনট = করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ই/ঈ -এর জায়গায় এ-কার (বা অয়্) , উ / ঊ -এর জায়গায় ও - কার (বা অব্), ঋ-এর স্থানে অর্ হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে স্বরের গুণ।

(২) ভূত + ষ্ণিক = ভৌতিক, অদিতি + ষ্ণ্য = আদিত্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে অ/আ-এর জায়গায় আ-কার, ই/ঈ-এর জায়গায় ঐ-কার বা আয়্ উ/ঊ-এর জায়গায় ঐ-কার (বা সাব্), ঋ-এর জায়গায় আর হওয়াকে বলে স্বরের বৃদ্ধি।

(৩) ব > উ (যেমন, √বচ্ + ক্ত = উক্ত), য > ই ((যজ্ + ক্তি = ইতি), র > ঋ (গ্রহ্ + ক্ত = গৃহীত) হলে তাকে স্বরের সম্প্রসারণ বলে।

পরিবর্তনের এই তিন ধারাকে একত্রে অপকর্ষ বলে।

এই কারণে প্রত্যয়ের নাম এক আর রূপ অন্য। আবার কখনো নাম আর রূপ একই হয়।

কৃৎ প্রত্যয়

ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাই হলো কৃৎ-প্রত্যয়। বলা বাহুল্য যে 'গম্' ধাতুর শব্দে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, সেগুলি কৃৎ-প্রত্যয়। সংস্কৃতে অনেকগুলি কৃৎপ্রত্যয় আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি যুক্ত হয়।

● করা উচিত বা করার যোগ্য বোঝাতে অনেকক্ষেত্রে তব্য, অনীয়, ন্যৎ, যৎ, ক্যপ্ — এই সব প্রত্যয় ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

√ বচ্ + তব্য = বক্তব্য

√ দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য

√ স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়

√ মান্ + অনীয় = মাননীয়

√ কৃ + ন্যৎ (য) = কার্য (ণ্ ও ৎ ইৎ)

√ শ্রু + ন্যৎ (য) = শ্রাব্য

√ রম্ + যৎ (য) = রম্য (ৎ, ইৎ)

√ দৃশ + ক্যপ্ (য) = দৃশ্য (ক্ ও প্ ইৎ)

● ক্রিয়া বা কাজটি যদি চলছে বা হচ্ছে বোঝায় তাহলে শতৃ বা শানচ্ প্রত্যয় ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

√ মহ্ + শতৃ (অৎ) = মহৎ (শ্ ও স্ম ইৎ)

√ বৃৎ + শানচ্ (আন) = বর্তমান (শ্ ও চ্ ইৎ)

√ বৃধ্ + শানচ্ (আন) = বর্ধমান

● কোনো কাজ আগে শুরু হয়ে এখন শেষ হয়েছে বোঝাতে ক্ত (ত) প্রত্যয় হয়।

√ স্না + ক্ত (ত) = স্নাত (ক্ ইৎ)

প্র - √নী + ক্ত (ত) = প্রণীত (ণত্ব বিধি অনুযায়ী)

√ লিখ্ + ক্ত (ত) = লিখিত

● কাজ বা ক্রিয়ার অবস্থা বা ভাব বোঝাতে ক্তি (তি) প্রত্যয় হয়

√ স্থা + ক্তি (তি) = স্থিতি (ক্ ইৎ)

√ ভী + ক্তি (তি) = ভীতি

√ গম্ + ক্তি (তি) = গতি

- স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ইষ্ণু, ক্বিপ্, আলু, উক, বর এই প্রত্যয়গুলি ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় :

√ চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু

√ সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু

সম্ -√ পদ + ক্বিপ্ = সম্পদ (সবটাই ইৎ, তাই এই প্রত্যয়কে শূন্য প্রত্যয় বলে)

√দয়্ + আলু = দয়ালু

√ ভূ (চিন্তা করা) + উক = ভাবুক

√ স্থা + বর = স্থাবর

- কোনো ক্রিয়া বা কাজ যিনি করেন বোঝাতে ণক, যক, তৃৎ, তৃণ্ এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়।

√ গা + ণক = গায়ক (ণ্ ইৎ)

√ পঠ্ + ণক = পাঠক

√ নৃৎ + যক = নর্তক (য্ ইৎ)

√ পা + তৃচ্ = পিতৃ (পিতা) (চ্ ইৎ)

√ মা + তৃচ্ = মাতৃ (মাতা)

√ দা + তৃণ্ = দাতৃ (দাতা) - (ন্ ইৎ)

তদ্ধিত প্রত্যয়

শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়। অপত্য অর্থে ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন প্রত্যয়; রচয়িতা, দক্ষতা, জীবিকা, সম্বন্ধ, জাত বা যোগ্য অর্থে ষ্ণীয়, ঈন্, ইত প্রত্যয়; ব্যাপ্তি বা স্বরূপ অর্থে ময়ট্ প্রত্যয়; কোনো কিছু অস্তিত্ব আছে বোঝাতে মতু প্, ইন্, বিন্, শালিন্ ইত্যাদি প্রত্যয় শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়।

অপত্য অর্থে	মনু + ষ্ণ = মানব	(ষ্, ণ্ ইৎ, অ থাকে)
	শিব + ষ্ণ = শৈব	
	দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি	(ষ্, ণ্ ইৎ, ই থাকে)
	দিত + ষ্ণ্য = দৈত্য	(ষ্, ণ্ ইৎ, য থাকে)
	গঙ্গা + ষ্ণেয় = গাঙ্গেয়	(ষ্, ণ্ ইৎ, এয় থাকে)
	দ্বীপ + ষ্ণায়ন = দ্বৈপায়ন	(ষ্, ণ্ ইৎ, আয়ন থাকে)
রচয়িতা, দক্ষতা পাণ্ডিত্য, জীবিকা অর্থে	নৌ + ষ্ণিক = নাবিক	(ষ্, ণ্ ইৎ, ই থাকে)
	সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক	
	ব্যবহার + ষ্ণিক = ব্যবহারিক	

সম্বন্ধ জাত বা যোগ্য অর্থে	মানব + ষ্ণীয় = মাননীয়
	দেশ + ষ্ণীয় = দেশীয়
	তৎকাল + ঈন্ = তৎকালীন
	সর্বাঙ্গ + ঈন্ = সর্বাঙ্গীণ
	ব্যথা + ইত = ব্যথিত
	পুষ্প + ইত = পুষ্পিত
ব্যাপ্তি বা স্বরূপ অর্থে	মৃৎ + ময়ট = মৃন্ময় (ট্ ইৎ)
	পৃথিবী + ময়ট = পৃথিবীময়
	মহিমা (মহিমন্) + ময়ট = মহিমময় (মহিমাময় নয়)

কোনো কিছু আছে বা অস্বিত্ব আছে বোঝাতে

- শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমৎ (শ্রীমান)
- শিখি + ইন্ = শিখিন (শিখা)
- মেধা + বিন্ = মেধাবিন (মেধাবী)
- বিত্ত + শালিন্ = বিত্তশালিন (বিত্তশালী)

বাংলা প্রত্যয়

এতক্ষণ যে প্রত্যয়গুলির নাম ও উদাহরণ দেওয়া হলো, সেগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব ধাতুর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে প্রচুর খাঁটি বাংলা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। বাংলা শব্দতৈরির কৌশল জানতে হলে তাই বাংলা

কৃৎ-প্রত্যয় এবং বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন।

প্রথমেই আসি বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়ের কথায় :

অ : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য তৈরিতে ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই 'অ' -এর উচ্চারণ লুপ্ত হয়ে যায়।

√ বাড়্ + অ = বাড়্ (ওর বড়ো বাড়্ বেড়েছে।)

√ চল্ + অ = চল্ (এইসব প্রথার আজ আর চল্ নেই।)

আ : 'অ' প্রত্যয়ের মতো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সৃষ্টিতে, আবার ভাববাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও 'আ' প্রত্যয়ের যোগ হয়। ক্রিয়াত্মক বিশেষণের ক্ষেত্রেও 'আ' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

√ চল্ + আ = চলা (পথে চলা),

√ খা + আ = খাওয়া

√পা + আ = পাওয়া

√ রাঁধ্ + আ = রাঁধা (রাঁধা ভাত) ইত্যাদি

অন, অনা : এই প্রত্যয় দুটিও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের জন্ম দেয়।

√বাড়্ + অন = বাড়ন,

√ কাঁদ্ + অন = কাঁদন, নাচ্ + অন = নাচন

√ রাঁধ্ + অনা = রান্না,

√ বাজ্ + অনা = বাজনা

উনি : এই প্রত্যয়ের চেহারা বহুক্ষেত্রে অনি > উনি হয়ে যায়।

√ রাঁধ্ + অনি (উনি) = রাঁধুনি, √ জ্বল্ + অনি (উনি) = জ্বলুনি

√ নাচ্ + অনি (উনি) = নাচুনি ইত্যাদি

আই/আও : ক্রিয়ার ভাব বোঝাতে এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়। যেমন :

√ বাঁধ্ + আই = বাঁধাই (এখানে বই বাঁধাই করা হয়।)

√ বাছ্ + আই = বাছাই,

(√ ঘের্ + আও = ঘেরাও ইত্যাদি।)

ই : একই কারণে 'ই' প্রত্যয়টিও যুক্ত হয়। যেমন :

√ হাস্ + ই = হাসি, √ ডুব্ + ই = ডুবি ইত্যাদি।

ইয়ে , আরি : কোনো কাজে দক্ষ বা পেশা বোঝাতে এই প্রত্যয় দুটি ব্যবহৃত হয়। যেমন :

√ বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে,

√গা + ইয়ে = গাইয়ে,

√ লিখ্ + ইয়ে = লিখিয়ে,

√ ডুব্ + আরি = ডুবুরি ইত্যাদি।

আকু : √ লড়্ + আকু = লড়াকু

ইয়া > এ : √ বল্ + ইয়া (> এ) = বলিয়া > বলে

√খেল্ + ইয়া (> এ) = খেলিয়া > খেলে ইত্যাদি

অন্ত : কোনো কাজ চলছে বোঝাতে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন :

√চল্ + অন্ত = চলন্ত,

√ বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত

√ পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত,

√ জ্বল্ + অন্ত = জ্বলন্ত ইত্যাদি

আন : √ মানা + আন = মানান (সই) (এই জামাটা বেশ মানানসই হয়েছে।)

√ চাল্ + আন = চালান (বস্তাটা <u>চালান</u> করে দাও।)

আনো : √ জানা + আনো = জানানো (ঘটনাটা ওকে <u>জানানো</u> দরকার।)

√ পড়্ + আনো = পড়ানো (এই বইটা তোমাকে <u>পড়ানো</u> প্রয়োজন।)

তা : √জান্ + তা = জান্তা (সবজান্তা লোক),

√পড়্ + তা = পড়তা (গরপড়তা),

√বহ্ + তা = বহতা (বহতা নদী)

তি : √কাট্ + তি = কাটতি (এ বছর এ জিনিসটার খুব <u>কাটতি</u>।)

√ঘাট্ + তি = ঘাটতি (বাজেটে <u>ঘাটতির</u> পরিমাণ অনেক।)

উয়া > ও : √পড়্ + উয়া = পড়ুয়া (পোড়ো)

√উড়্ + উয়া (> ও) = উড়ুয়া (উড়ো, উড়োচিঠি)

উক : স্বভাব অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

√নিন্দ্ +উক = নিন্দুক, মিশ্ + উক = মিশুক

ক : √মুড়্ + ক = মোড়ক,

√চড়্ + ক = চড়ক

এবারে আসি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের কথায় :

আ : কখনো সাদৃশ্য অর্থে, যেমন :

হাত + আ = হাতা   বাঘ + আ = বাঘা

কোনো কিছু তৈরি বা আগত অর্থে :

পশ্চিম + আ = পশ্চিমা

চিন + আ = চিনা

অনাদরে নামের বিকৃতি ঘটিয়ে :

গোপাল + আ = গোপলা

কেষ্ট + আ = কেষ্টা

নেপাল + আ = নেপলা

বিশেষ কোনো বস্তু আছে বা তার অস্তিত্ব বোঝাতে :

নুন + আ = নোনা   জল + আ = জলা

তেল + আ = তেলা

আই : কোনো কিছুর ভাব বোঝাতে, যেমন : চিকনের ভাব বোঝাতে চিকন + আই = চিকনাই। তেমনই , বড়ো + আই = বড়াই। সম্বন্ধ বোঝাতেও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন:

ভোর + আই = ভোরাই

চোর + আই = চোরাই

মোগল + আই = মোগলাই

আম (> আমো) : ভাব বা কর্ম অর্থে—

পাকা + আম (> আমো) = পাকামো

ন্যাকা + আম (> আমো) = ন্যাকামো

নষ্ট + আম (> আমো) = নষ্টামো

আমি : যে করে অর্থে —

পাকা + আমি = পাকামি

ন্যাকা + আমি = ন্যাকামি

নষ্ট + আমি = নষ্টামি

আল, আলো :

কাজ বা পেশা বোঝাতে :

লাঠি + আল = লাঠিয়াল

সম্পর্ক বোঝাতে :

পাঁক + আল = পাঁকাল

দাঁত + আল = দাঁতাল

রস + আলো = রসালো

ধার + আলো = ধারালো

জমক + আলো = জমকালো

ওয়ালা, আলি : পেশা বা বৃত্তি অর্থে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয় :

বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা > বাড়িওলা

ফেরি + ওয়ালা = ফেরিওয়ালা > ফেরিওলা

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে 'ওলা'র জায়গায় 'উলি' হয়। যেমন: বাড়িউলি।

ঘটক + আলি = ঘটকালি

শাঁখ + আরি = শাঁখারি

কাঁসা + আরি = কাঁসারি

ই : আছে বা বৃত্তি বা দক্ষতা বোঝাতে :

তেজ + ই = তেজি   দাম + ই = দামি

ঢাক + ই = ঢাকি   সেতার + ই = সেতারি

যা দিয়ে, যে জায়গায় তৈরি বা কোনো রঙের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে :

রেশম + ই = রেশমি

পশম + ই = পশমি

বাদাম + ই = বাদামি

আকাশ + ই = আকাশি

কাশ্মীর + ই = কাশ্মীরি

বেনারস + ই = বেনারসি

ইয়া (> এ) : নানা অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন :

পাথর + ইয়া (> এ) = পাথুরিয়া 〉 পাথুরে ('আছে' অর্থে)

জোগাড় + ইয়া (> এ) = জোগাড়ে (বৃত্তি অর্থে)

কাগজ + ইয়া (> এ) = কাগুজে (সাদৃশ্য অর্থে)

উয়া (> ও) :

মাছ + উয়া (> ও) = মাছুয়া > মেছো (বৃত্তি অর্থে)

টাক + উয়া (> ও)= টেকো (আছে অর্থে)

ভাত + উয়া (> ও) = ভেতো (সম্বন্ধ বোঝাতে)

স্বভাব বা গুণ দোষ বা সম্বন্ধ অর্থে অনেকগুলি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

টিয়া > টে : ঝগড়া + টিয়া > টে = ঝগড়াটে

পনা : ন্যাকা + পনা = ন্যাকাপনা,

সতী + পনা = সতীপনা

উড়িয়া > উড়ে : ফাঁস + উড়ে = ফাঁসুড়ে

চি : তবলা + চি = তবলচি

পানা : রোগা + পানা = রোগাপানা,

পারা : পাগল + পারা = পাগলপারা ইত্যাদি।

বিদেশি প্রত্যয়

বাংলা শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় তোমরা দেখেছ যে প্রচুর বিদেশি শব্দ আছে আমাদের বাংলা ভাষায়; এর সঙ্গে আছে প্রচুর সংকর শব্দ। বিশেষ করে ফারসি, আরবি, তুর্কি শব্দের তদ্ধিত প্রত্যয় বাংলার নিজস্ব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংকর শব্দের সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি উদাহরণ তোমাদের জন্য রইল।

পেশা, দক্ষতা বা আচরণ অর্থে আনা (আনি), গিরি, নবিশ, বাজ, গর ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; বাবু + আনা (আনি) = বাবুয়ানা (বাবুয়ানি)।

একইরকমভাবে সাহেবিয়ানা, মুন্সিয়ানা ইত্যাদি। আবার,

গোয়েন্দা + গিরি = গোয়ান্দাগিরি,

দারোগা + গিরি = দারোগাগিরি

— পেশা বোঝাতে

নকল + নবিশ = নকলনবিশ —লেখক অর্থে

মামলা + বাজ = মামলাবাজ
ফাঁকি + বাজ = ফাঁকিবাজ
} — আচরণ/দক্ষতা অর্থে

বাজি + গর = বাজিগর
জাদু + গর = জাদুগর
} — বৃত্তি অর্থে

এছাড়া স্থান বোঝাতে 'স্তান' (হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান), 'খানা' (ডাক্তারখানা, বৈঠকখানা), আধার বোঝাতে 'দান' বা 'দানি' (বাতিদান, ধূপদানি), আসক্তি বোঝাতে 'খোর' (নেশাখোর, ঘুষখোর) ইত্যাদি প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে।

হাতে কলমে

১.নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১.১ কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১.২ তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১.৩ শব্দের অপকর্ষ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

১.৪ প্রত্যয় ও বিভক্তির তুলনা করো।

১.৫ শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজন, উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

২.শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ ______ + তব্য = দাতব্য

২.২ পা + ______ = পানীয়

২.৩ মহিমা + ময়ট = ______

২.৪ ______ + কীয় = রাজকীয়

২.৫ ______ + ______ = আফগানিস্তান

৩.নীচের শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় ভেঙে লেখো :

৩.১ মেছো

৩.২ সাপুড়ে

৩.৩ চটকদার

৩.৪ পাঠক

৩.৫ ডুবন্ত

৩.৬ সাধন

৩.৭ রান্না

৩.৮ মানব

৩.৯ প্রীতি

৩.১০ বুদ্ধিমান

৩.১১ চলিষ্ণু

৩.১২ সেতার

৩.১৩ পিলখানা

৩.১৪ ভীত

৩.১৫ মধুময়

৩.১৬ দাশরথি

পঞ্চম অধ্যায়

কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গ

কারক

একটি বাক্য দুই ধরনের পদ নিয়ে তৈরি হয়। বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদগুলিকে বলা হয় নামপদ। এছাড়া থাকে ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়াপদ। উহ্য বা প্রকাশ্য— যাই হোক না কেন, বাক্যে ক্রিয়াপদের উপস্থিতি আবশ্যিক। বাক্যের নামপদগুলি এই সমাপিকা ক্রিয়াটির সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে অন্বিত থাকে। একটি বাক্য নীচে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হলো—

মাঝরাত্তিরে খিদেতে হাবুল রান্নাঘরে হাঁড়ি থেকে চামচ দিয়ে পায়েস খাচ্ছিল।

এই দৃষ্টান্তবাক্যটির ক্ষেত্রে ‘খাচ্ছিল’ পদটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ। বাক্যস্থিত বিভিন্ন নামপদগুলির সঙ্গে এই ক্রিয়াপদের অন্বয়ের ধরন আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে—

নামপদ	সমাপিকা ক্রিয়াপদ	অন্বয়ের ধরন	সম্বন্ধ
১. হাবুল + [অ]	খাচ্ছিল	কে?	কর্তৃ-সম্বন্ধ
২. পায়েস + [অ]	খাচ্ছিল	কী?	কর্ম-সম্বন্ধ
৩. চামচ + [দিয়ে]	খাচ্ছিল	কী দিয়ে?	করণ-সম্বন্ধ

নামপদ	সমাপিকা ক্রিয়াপদ	অন্বয়ের ধরন	সম্বন্ধ
৪. খিদে [+ তে]	খাচ্ছিল	কেন?	নিমিত্ত-সম্বন্ধ
৫. হাঁড়ি [+ থেকে]	খাচ্ছিল	কোথা থেকে?	অপাদান-সম্বন্ধ
৬. রান্নাঘর [+ এ]	খাচ্ছিল	কোথায়?	অধিকরণ-সম্বন্ধ
মাঝরাত্তির [+ এ]	খাচ্ছিল	কখন?	অধিকরণ-সম্বন্ধ

উপরের বিশেষ্য বা নামপদগুলি ‘খাচ্ছিল’ সমাপিকা ক্রিয়াপদটির সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধে অন্বিত। বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্বন্ধকেই কারক বলা হয়।

১.‘হাবুল’— বিশেষ্য পদটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃ-সম্বন্ধে অন্বিত, সুতরাং এটি কর্তৃকারক।

২.‘পায়েস’— বিশেষ্য পদটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম-সম্বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং, এটি কর্মকারক।

৩.‘চামচ’— বিশেষ্য পদটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে করণ-সম্বন্ধে অন্বিত, সুতরাং এটি করণ কারক।

৪.‘খিদে’— বিশেষ্য পদটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে নিমিত্ত সম্বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং, এটি নিমিত্ত কারক।

৫.‘হাঁড়ি’— বিশেষ্য পদটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে আপাদান-সম্বন্ধে অন্বিত, সুতরাং, এটি অপাদান কারক।

৬.‘রান্নাঘর’ এবং ‘মাঝরাত্তির’—

বিশেষ্য পদদুটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অধিকরণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং এরা অধিকরণ কারক।

অতএব, কারক এই ছয় প্রকার। যথাক্রমে— কর্তা, কর্ম, করণ, নিমিত্ত, অপাদান ও অধিকরণ।

বিভক্তি

দৃষ্টান্তবাক্যটির বিশেষ্য পদগুলি খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, পদগুলির অতিরিক্ত কতগুলি অর্থহীন ধ্বনি, ধ্বনিগুচ্ছ বা সার্থক শব্দ যুক্ত হয়েই এদের পদবাচ্য করে তুলছে।

‘মাঝরাত্তির খিদে হাবুল রান্নাঘর হাঁড়ি চামচ পায়েস খাচ্ছিল’ — লিখলে, অর্থাৎ, এই অর্থহীন ধ্বনি বা সার্থক শব্দগুলি, যেগুলি বিশেষ্যের সঙ্গে

যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বা কারক ব্যাখ্যা করছে, এগুলিকে বাদ দিলে বাক্যটির অর্থবোধেই সমস্যা হবে। বস্তুত, এটি তখন আর কোনো বাক্যই থাকবে না, কতগুলি শব্দের সমাহার মাত্র হবে। দৃষ্টান্তবাক্যে 'হাবুল' এবং 'পায়েস' শব্দদুটির সঙ্গে কিছু যুক্ত হয়নি। কিন্তু 'মাঝরাত্তির'-এর সঙ্গে 'এ', 'খিদে'-র সঙ্গে 'তে', 'রান্নাঘর' -এর সঙ্গে 'এ', 'হাঁড়ি'-র সঙ্গে 'থেকে' এবং 'চামচ'-এর সঙ্গে 'দিয়ে' যুক্ত হয়ে কারক ব্যাখ্যা করেছে।

সুতরাং, যে সকল চিহ্ন [অর্থহীন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ এবং সার্থক শব্দ] বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যস্থিত বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদ অথবা বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় পদগুলির পরস্পরের

মধ্যে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করে দেয়, তাদের কারক-চিহ্ন বা বিভক্তি বলা হয়।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এই বিভক্তি বা কারক-চিহ্নগুলির কয়েকটি অর্থহীন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ, কয়েকটি আবার সার্থক শব্দ। যেমন, ‘তে’ অর্থহীন ধ্বনি; আর ‘থেকে’ সার্থক শব্দ। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভক্তির মধ্যেও দুটি শ্রেণি দেখা যায়। যথাক্রমে, মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন এবং অনুসর্গ-বিভক্তি চিহ্ন।

মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন এবং অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্ন

যেসব অর্থহীন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ কারক-চিহ্ন হিসেবে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের পদ-এ রূপান্তরিত করে, তাদের

মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন বলে। যেমন— এ, তে, এতে, য়, কে, রে, র, এর ইত্যাদি।

আর, যে সব সার্থক শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারক নির্দেশ করে এবং শব্দগুলিকে পদ-এ উত্তীর্ণ করে, তাদের বলা হয় অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্ন। যেমন— দ্বারা, দিয়ে, নিমিত্ত, উদ্দেশে, তরে, জন্যে, লাগিয়া, বলিয়া, বলে, হইতে, থেকে, দিকে, নিকটে, কাছে ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন কারকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-চিহ্ন নির্দিষ্ট আছে। বাংলা ভাষায় নিয়ম অনেক শিথিল। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে করণ এবং নিমিত্ত কারক তৈরির সময়, পৃথক পৃথক

সার্থক শব্দ ব্যবহার করে বিভক্তির কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। এইগুলিই অনুসর্গ। মৌলিক বিভক্তিগুলি যেভাবে শব্দের সঙ্গে জুড়ে একাত্ম হয়ে যায়, অনুসর্গ কিন্তু সেভাবে জমাট বাঁধে না। তারা শব্দের থেকে বিচ্ছিন্নই থাকে। তাছাড়া মৌলিক বিভক্তি-চিহ্নগুলির বা কারক-চিহ্নগুলির শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আলাদা কোনো মানে থাকে না। অনুসর্গগুলি অর্থযুক্ত শব্দ। শব্দের সঙ্গে জুড়ে ব্যবহৃত না হলেও তাদের নিজস্ব মানে বজায় থাকবে। এই দুটো বড়ো পার্থক্য থাকলেও উভয়েরই কাজ কিন্তু এক, শব্দকে পদে রূপান্তরিত করা। আর একভাবে বললে, বাক্যের বিভিন্ন পদগুলির কারক সম্বন্ধ নির্ণয় করে দেওয়া।

বিভিন্ন কারকে বিভক্তি-চিহ্ন

‘ছাত্র’ শব্দের রূপ

কারক		একবচন	বহুবচন
কর্তা	→	[ছাত্র + অ] = ছাত্র	[ছাত্র + রা] = ছাত্ররা
কর্ম	→	[ছাত্র + কে] = ছাত্রকে	[ছাত্র + দের (+ কে)] = ছাত্রদের, ছাত্রদেরকে
করণ	→	[ছাত্র + (কে) + দিয়ে] = ছাত্রকে দিয়ে	[ছাত্র + দের + দিয়ে] = ছাত্রদের দিয়ে
নিমিত্ত	→	[ছাত্র + (এর) + জন্যে] = ছাত্রের জন্যে	[ছাত্র + দের + জন্যে] = ছাত্রদের জন্যে

কারক	একবচন	বহুবচন
অপাদান	→ [ছাত্র + (এর) + থেকে (চেয়ে)] = ছাত্রের থেকে, ছাত্রের চেয়ে	[ছাত্র + দের + থেকে (চেয়ে)] = ছাত্রদের থেকে, ছাত্রদের চেয়ে
অধিকরণ	→ [ছাত্র + এ (তে, এর মধ্যে)] = ছাত্রে, ছাত্রেতে, ছাত্রের মধ্যে	[ছাত্র + দের + এ (তে, এর মধ্যে)] = ছাত্রদেরে, ছাত্রদেরেতে, ছাত্রদের মধ্যে
সম্বন্ধ পদ	→ [ছাত্র + এর (র)] = ছাত্রের	[ছাত্র + দের] ছাত্রদের

তির্যক বিভক্তি

‘ছাত্র’ শব্দের রূপ থেকে দেখা যাবে ‘এ’ বিভক্তি বিশেষভাবে অধিকরণ কারকের বিভক্তি- চিহ্ন হিসেবেই নির্দিষ্ট, কিন্তু বাংলা ভাষায় ‘এ’ বিভক্তিটি যে-কোনো কারকেই প্রযুক্ত হতে পারে। যে-কোনো পদকেই ক্রিয়ার সঙ্গে তির্যকভাবে অন্বিত করে বলে একে তির্যক বিভক্তি বলা হয়।

যেমন—

দশে মিলে করি কাজ। (কর্তা)

পাঠাইব **রামানুজে** শমন ভবনে। (কর্ম)

চাঁদ সদাগর **বাঁ-হাতে** ফুল দিলেন। (করণ)

তিনি **আহারে** বসেছেন। (নিমিত্ত)

কত **ধানে** কত চাল। (অপাদান)

কর্তৃকারক

যে বিশেষ্য বা বিশেষ্য-স্থানীয় পদ বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদন করে তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধকে কর্তৃকারক বলে। অর্থাৎ, কর্তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্কের নাম কর্তৃকারক। বাক্যের ক্রিয়া-সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্তার স্বাধীনতা আছে। যেমন,

'তাঁতি তাঁত বুনছিল।'— বাক্যটির 'বুনছিল' ক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে বাক্যটির কর্তা 'তাঁতি'-পদটি।

অনেক সময় বাক্যের কর্তা উহ্য থেকেও ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। যেমন,

'আমাকে খেতে দাও।'— বাক্যে 'তুমি' কর্তাটি উহ্য, তা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে।

কর্তার প্রকারভেদ

১.কর্তৃবাচ্যের কর্তা :

কর্তৃবাচ্যে কর্তাই ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ, ক্রিয়া কর্তার নিয়ন্ত্রিত।

যেমন, আজ **বড়োমামা** এসেছেন।

২.প্রযোজক কর্তা :

কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিলে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

যেমন, **মা** তাকে খাইয়ে তবে বাড়ি পাঠালেন।

৩.প্রযোজ্য কর্তা :

অন্যের প্রভাবে যদি কেউ কোনো কাজ সম্পন্ন করে, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।

যেমন, রাখাল **গোরু** চরায়।

৪.সমধাতুজ কর্তা :

একই ধাতু থেকে উৎপন্ন বিশেষ্য বা বিশেষণস্থানীয় পদ কর্তারূপে ব্যবহৃত হলে

তাকে সমধাতুজ, অর্থাৎ, একই ধাতু থেকে জাত কর্তা বলে। এদের ধাত্বর্থক (ধাতু + অর্থক) কর্তা-ও বলা হয়।

যেমন, **লেখক** লেখেন।

৫.ব্যতিহার কর্তা :

কোনো ক্রিয়ার একাধিক কর্তা থাকলে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলে কর্তাগুলিকে একসঙ্গে ব্যতিহার কর্তা বলা হয়। যেমন, **পণ্ডিতে-পণ্ডিতে** তর্ক করছিলেন।

৬.বাক্যাংশ কর্তা :

কোনো বাক্যাংশ ক্রিয়া সম্পাদন করলে তাকে বাক্যাংশ কর্তা বলে। এক্ষেত্রে গোটা বাক্যাংশটিই কর্তার আচরণ করে থাকে।

যেমন, **তোমার এমন কাজ করাটা** ভালো হয়নি।

৭.উপবাক্যীয় কর্তা :

বাক্যের অন্তর্গত খণ্ডবাক্যকে উপবাক্য [clause] বলা হয়। কোনো বাক্যের অন্তর্গত উপবাক্য যদি কর্তারূপে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তবে তাকে উপবাক্যীয় কর্তা বলে।

যেমন, **সে এভাবে চলে যাবে** ভাবা যায় না।

৮.উহ্য কর্তা :

মধ্যম পুরুষ বা তুমি পক্ষ এবং উত্তমপুরুষ বা আমি পক্ষের কর্তা অনেক সময়েই উহ্য থাকে। এদের বলে উহ্য কর্তা।

যেমন, এখানে এসে বসো। — '**তুমি**' উহ্য।

৯.বহুক্রিয়ায় এক কর্তা :

একই কর্তার অধীনে বহু সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তাকে এই নামে ডাকা হয়।

যেমন, **শিশুটি** কেবলই হাসছে আর খেলছে আর নাচছে আর গাইছে।

১০. এক ক্রিয়ার বহু কর্তা :

অনেক সময় একটিই ক্রিয়ার একাধিক কর্তাও থাকে।

যেমন, যুদ্ধের পরেই এল **রোগ**, **শোক**, **মহামারি**।

১১. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা :

বাক্যের কর্তার অনুপস্থিতিতে কর্ম যদি কর্তার আচরণ করে তবে তাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা বলা হয়।

যেমন, এখানে এখন আর **বাজার** বসে না।

১২. নিরপেক্ষ কর্তা :

কোনো বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা, উভয় ক্রিয়াই থাকলে এবং ক্রিয়াদুটির বিভিন্ন কর্তা

থাকলে, অসমাপিকা ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক কর্তাটিকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা।

যেমন, **উৎসব** এলে গোটা পাড়া যেন জেগে ওঠে।

১৩. সহযোগী কর্তা :

একই বাক্যে দুটি কর্তা থাকলে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাব থাকলে তাদের সহযোগী কর্তা বলা হয়।

যেমন, **তোমাতে আমাতে** মিলে কাজটা সেরে ফেলি চলো।

কর্মকারক

কর্তা যা সম্পাদন করে অথবা যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে কর্ম বলে। কর্ম-এর সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধকে বলা হয় কর্মকারক।

‘সে ভাইকে কলমটা দিয়েছে।’ — বাক্যটির ‘ভাইকে’ এবং ‘কলমটা’ কর্মকারক। কর্মকারকে ‘কে’, ‘রে’, ‘এরে’ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়।

কর্মের প্রকারভেদ

১. মুখ্য কর্ম :

কোনো বাক্যে দুটি কর্ম থাকলে তাকে দ্বিকর্মক বাক্য বলা হয়। এই কর্মদুটির একটি হয় বস্তুবাচক, অপরটি ব্যক্তিবাচক। বস্তুবাচক কর্মটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম। ক্রিয়াকে ‘কী’ প্রশ্ন করলে এই কর্মটি পাওয়া যায়।

যেমন, আমি তোমায় একটা **বই** দেবো।

২. গৌণকর্ম :

দ্বিকর্মক বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে বলা হয় গৌণকর্ম। ক্রিয়াকে ‘কাকে’ প্রশ্ন করলে এই কর্মটি পাওয়া যাবে।

যেমন, সে কি **তোমাকে** একটা বল দিয়েছিল?

৩. উদ্দেশ্য কর্ম :

কোনো কোনো ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি কর্ম ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পরিপূরক কর্মের প্রয়োজন পড়ে। বিভক্তি-যুক্ত স্বাভাবিক কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম।

যেমন, তুমি **আমাকে** সং সাজালে।

৪. বিধেয় কর্ম :

পরিপূরক হিসেবে দ্বিতীয় যে কর্মটি আসে সেই বিভক্তিহীন অতিরিক্ত কর্মটিকেই বলা হয় বিধেয় কর্ম।

যেমন, তিনি বিদ্যালয়কে **উপাসনাস্থল** মনে করতেন।

৫. সমধাতুজ কর্ম :

কর্ম ও ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে কর্মটিকে বলা হয় সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক (ধাতু + অর্থক) কর্ম।

যেমন, দুই বোনে কী **হাসাই** না হাসতে পারে।

৬. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্ম :

কর্মই যেখানে কর্তারূপে ক্রিয়া সম্পাদন করে সেখানে কর্ম-কর্তৃবাচ্য হয়।

যেমন, **কোরককে** পঞ্চকের ভূমিকায় চমৎকার মানিয়েছিল।

৭. বাক্যাংশ কর্ম :

সমাপিকা ক্রিয়াবিহীন বাক্যাংশ কর্মরূপে ব্যবহৃত হলে এই নামে ডাকা হয়।

যেমন, **তার এই দিনের পর দিন না আসা** আমি আর সহ্য করব না।

৮. উপবাক্যীয় কর্ম :

বাক্যের অন্তর্গত কোনো উপবাক্য কর্মরূপে ব্যবহৃত হলে তাকে উপবাক্যীয় কর্ম বলে।

যেমন, **শেষ অবধি তাদের কী হলো** কেউ জানে না।

৯. কর্মের বীপ্সা :

পুনরাবৃত্তির ফলে কর্মের বীপ্সা ঘটে। অর্থাৎ, একই কর্ম পুনরাবৃত্ত হলে তাকে বীপ্সা বলা হয়।

যেমন, **কী কী** আনতে হবে ভুলে যেও না।

১০. অসমাপিকা ক্রিয়ারূপী কর্ম :

অসমাপিকা ক্রিয়া ভাববাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে কর্মের আচরণ করলে তাকে এই নামে ডাকা হয়ে থাকে।

যেমন, খোকা এখন **চলতে** শিখেছে।

করণ কারক

কর্তা যে পদের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ককে করণ কারক বলে। অর্থাৎ, যার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, তাতে করণ কারক হয়। যেমন, আমরা **চোখ দিয়ে** দেখি।

করণ কারক বোঝাতে ‘এ’, ‘তে’, ‘য়’, ‘এতে’ প্রভৃতি বিভক্তি এবং ‘দ্বারা’, ‘দিয়ে’, ‘করে’, ‘সাহায্যে’, ‘কর্তৃক’ ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

করণের প্রকারভেদ

১.সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণ :

কোনো বস্তু বা যন্ত্র দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাকে এই নামে ডাকা হয়।

যেমন, তিনি **জাঁতি দিয়ে** মিহি করে সুপারি কুচোবেন।

২.উপায়াত্মক করণ :

যে উপায়ের দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয় তাকে উপায়াত্মক করণ বলে।

যেমন, শুধুমাত্র **বুদ্ধিতে** সে সবাইকে টেক্কা দিয়ে গেল।

৩.হেত্বর্থক করণ :

হেতু বা কারণ বোঝাতে হেত্বর্থক করণ হয়।

যেমন, **দুঃখে** তার গাল বেয়ে টপটপ জল পড়তে লাগল।

৪.কালাত্মক করণ :

কাল বা সময় বোঝাতে কালাত্মক করণ হয়।

যেমন, **একবছরেই** তার সখ মিটে গেল।

৫.উপলক্ষণে করণ :

কোনো লক্ষণ বা চিহ্ন বোঝাতে উপলক্ষণার্থক করণ হয়।

যেমন, **গোঁফ দিয়ে** যায় চেনা।

৬.অসমাপিকা ক্রিয়ারূপী করণ :

কোনো অসমাপিকা ক্রিয়া করণের আচরণ করলে তাকে এই নাম দেওয়া হয়।

যেমন, সে **কেঁদে** মন জয় করতে চায়।

৭.সমধাতুজ করণ :

ক্রিয়া ও করণ রূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় পদটি একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে এই করণ হয়।

যেমন, শক্ত **বাঁধনে** বেঁধেছি।

৮.করণের বীপ্সা :

পুনরাবৃত্তির ফলে করণেও বীপ্সা হয়।

যেমন, **হাতে হাতে** কাজটা সেরে ফেলা হলো।

নিমিত্ত কারক

নিমিত্ত, জন্য, উদ্দেশে বা উদ্দেশ্যে বোঝাতে নিমিত্ত কারক হয়। বাক্যের মধ্যে নিষ্পন্ন ক্রিয়ায় অনেক সময় এই ভাবগুলি প্রধান হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নিমিত্ত কারক হয়। যেমন, 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল,'— বাক্যটিতে 'জলকে' অর্থাৎ জল আনবার জন্যে বা উদ্দেশ্যে চলার কথা বলা হয়েছে।

নিমিত্ত কারকের প্রকারভেদ

১. 'জন্য' বোঝাতে নিমিত্ত কারক হয়, যেমন, তিনি **দেশের জন্য** আত্মবিসর্জন করেছিলেন।

২. 'উদ্দেশ্য' অর্থে নিমিত্ত কারক হয়ে থাকে। যেমন, তিনি **বাজারে** গেছেন। [বাজার করার উদ্দেশ্যে]

৩. 'উদ্দেশ' অর্থেও নিমিত্ত কারক হতে পারে। যেমন, সভাপতি **সকলের উদ্দেশে** বক্তব্য পেশ করলেন।

অপাদান কারক

যা থেকে কোনো কিছু উৎপন্ন, পতিত, নির্গত বা বিশ্লিষ্ট হয়, তা-ই অপাদান কারক। অপাদান কারকে ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একটি গতি বা চলিষ্ণুতার ভাব প্রধান হয়ে ওঠে। যা থেকে বস্তু বা ব্যক্তি গতি লাভ করে এবং সেই গতির উৎস

বা বিচ্ছেদের সীমাতে অপাদান কারকের ভাব হয়। কিন্তু যে বস্তু বা ব্যক্তি গতি লাভ করে অথবা উৎপন্ন, নির্গত, চলিত, ভীত, বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হয়, তাতে কিন্তু অপাদান কারক হয় না। কর্তৃকারক হয়। অবশ্য আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে, ক্রিয়ার সঙ্গে অপাদান কারকের সম্বন্ধ স্পষ্ট নয়। তিনি এই কারকটির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। 'হবে', 'থেকে', 'চেয়ে' প্রভৃতি অনুসর্গ যোগে অপাদান কারক হয়।

অপাদান কারকের প্রকারভেদ

১.আধার বা স্থানবাচক অপাদান :

কোনো আধার বা স্থান থেকে বিশ্লেষ বা চ্যুতি বোঝালে আধার বা স্থানবাচক অপাদান হয়।

যেমন, **গাছ থেকে** ফুল ঝরে পড়ল।

২.অবস্থানবাচক অপাদান :

কোনো অবস্থান থেকে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে এই অপাদান হয়।

যেমন, এলেম আমি **কোথা হতে**?

৩.কালবাচক অপাদান :

কাল বা সময় বোঝালে কালবাচক অপাদান হয়।

যেমন, সে **কখন থেকে** এসে বসে আছে।

৪.দূরত্ববাচক অপাদান :

কোনো স্থান থেকে দূরত্ব বোঝালে দূরত্ব বাচক অপাদান হয়।

যেমন, তার বাড়ি **এখান থেকে** তিন মাইল দূরে।

৫.তারতম্যবাচক অপাদান :

দুই বা তার বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করতে এই ধরনের অপাদান হয়।

যেমন, **আমার চেয়ে** ও অঙ্কে ভালো।

৬.অসমাপিকা ক্রিয়ারূপী অপাদান :

অনেক সময় অসমাপিকা ক্রিয়া অপাদানের আচরণ করে।

যেমন, আমার **মরতে** [মরণ থেকে] ভয় নেই।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা হয়। অধিকরণ পদটির সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ককে বলে অধিকরণ কারক। কোনো স্থান, কাল অথবা বিষয়ে আধারিত হয়ে ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়। এই কারণে অধিকরণও স্থানাধিকরণ, কালাধিকরণ, ভাবাধিকরণ, বিষয়াধিকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ

নেয়। অধিকরণ কারকে ‘এ’, ‘তে’, ‘এতে’, ‘য়’ প্রভৃতি বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। আবার ‘ভিতরে’, ‘মধ্যে’, ‘উপরে’, ‘পানে’, ‘পাশে’, ‘নীচে’ প্রভৃতি শব্দও অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অবশ্য করণ ও অধিকরণ কারককে অভিন্ন মনে করেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই বিভক্তি-চিহ্নের অভিন্নতা তাঁর এই চিন্তার পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

অধিকরণ কারকের প্রকারভেদ

১. স্থানাধিকরণ :

সে এখন **বিলেতে** আছে। [স্থানবাচক]

হাটে লোক গিজগিজ করছে। [স্থানের ব্যাপ্তিবাচক]

ফটকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। [সামীপ্য বাচক]

২.কালাধিকরণ :

তিনি রাত **দশটায়** গাড়ি ধরলেন। [বিশেষ ক্ষণবাচক]

বর্ষাকালে এই নদীতেই টইটম্বুর জল থাকে। [সময়ের ব্যাপ্তিবাচক]

৩.ভাবাধিকরণ :

দুঃখে সে ভেঙে পড়েছে। [ভাববাচক]

৪.বিষয়াধিকরণ :

ব্যাকরণে তার ধারে কাছে কেউ নেই। [বিষয়বাচক]

সম্বন্ধ পদ

কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপর অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির অধিকার থাকলে তাকে সম্বন্ধ পদ বলা হয়। 'কার' — এই প্রশ্নের উত্তরে সম্বন্ধ পদটি

পাওয়া যায়। যেমন--- ‘প্রাণের বেদনা’, ‘কোথাকার লোক’, ‘টেবিলের পায়া’ ইত্যাদি। ‘র’, ‘এর’, ‘কার’ প্রভৃতি প্রত্যয় বাংলা সম্বন্ধ পদের চিহ্ন। লক্ষণীয়, সম্বন্ধ পদের সঙ্গে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কোনো অন্বয় হয় না, তাই একে কারক বলা যায় না। তবে ইংরিজি ‘case’ অর্থে সম্বন্ধ পদকেও পরোক্ষভাবে কারকের সগোত্র ভাবা যেতে পারে। কারণ এখানেও কোনো না কোনো শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদকে কারকের সঙ্গে অথচ বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করাই রীতিসংগত।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

১.সামান্য সম্বন্ধ বা সাধারণ সম্বন্ধ : গঙ্গার জল, খাঁচার পাখি, মনের মানুষ ইত্যাদি।

২.অধিকার বা স্বামিত্ব সম্বন্ধ : পাখির বাসা, যক্ষের ধন, রাজার বাড়ি ইত্যাদি।

৩.অঙ্গ বা অংশ সম্বন্ধ : বাঘের ছাল, হরিণের শিং, হাতির দাঁত ইত্যাদি।

৪.উপাদান সম্বন্ধ : তালপাতার বাঁশি, মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া ইত্যাদি।

৫.জন্য-জনক সম্বন্ধ : পুকুরের মাছ, গাছের ফল, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদি।

৬.কার্যকারণ সম্বন্ধ : বিদ্যুতের আলো, কাচের শব্দ, রোদের তাপ ইত্যাদি।

৭.নিমিত্ত সম্বন্ধ : পড়ার বই, খাবার ঘর, লেখার টেবিল ইত্যাদি।

৮.অভেদ সম্বন্ধ : চাঁদের হাট, হাসির আলো, অশিক্ষার অভিশাপ ইত্যাদি।

৯.কর্তৃ সম্বন্ধ : পাখির ডাক, দেবতার গ্রাস, খোকার নাচন ইত্যাদি।

১০. কর্ম সম্বন্ধ : ঢাকের বাজনা, জীবের সেবা, গাছের যত্ন ইত্যাদি।

১১. করণ সম্বন্ধ : কলমের খোঁচা, কলের তেল, হাতের কাজ ইত্যাদি।

১২. অপাদান সম্বন্ধ : বাঘের ভয়, মাথার ঘাম, কলকাতার দক্ষিণ ইত্যাদি।

১৩. অধিকরণ সম্বন্ধ : গ্রামের মানুষ, পালের গোদা, রাতের বাজার ইত্যাদি।

১৪. বিশেষণ সম্বন্ধ : শ্রদ্ধার পাত্র, আনন্দের কথা, অভাবের সংসার ইত্যাদি।

১৫. তারতম্যবাচক সম্বন্ধ :আমার চেয়ে, তার অপেক্ষা, মরণের অধিক ইত্যাদি।

১৬. অব্যয়-যোগে : শত্রুর সঙ্গে, ইস্কুলের কাছে, মতের বিপক্ষে ইত্যাদি।

হাতে কলমে

১.নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

১.১ কারক কাকে বলে? সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় কিনা বিচার করো।

১.২ শব্দবিভক্তি কাকে বলে? বাংলায় শব্দবিভক্তি কয় রকমের ও কী কী?

১.৩ অনুসর্গ কাকে বলে? একে অন্য কী নামে ডাকা যায়? কোন কোন কারকে অনুসর্গের ব্যবহার রয়েছে?

১.৪ বিভক্তি ও অনুসর্গের মিল ও অমিল আলোচনা করো।

১.৫ এমন একটি বাক্য লেখো যেখানে সমস্ত কারকের প্রয়োগ আছে। রচিত বাক্যটিতে

কোন কারকে কোন বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে, চিহ্নিত করো।

১.৬ 'অ'-বিভক্তি কী? কোন কোন কারকে 'অ'-বিভক্তি হয় উদাহরণসহ দেখাও।

১.৭ 'তির্যক বিভক্তি' কী? দৃষ্টান্তসহ এমন নামের কারণ বুঝিয়ে দাও।

২.উদাহরণসহ লেখো :

২.১ গৌণকর্ম

২.২ প্রযোজক কর্তা

২.৩ কালাধিকরণ

২.৪ ব্যতিহার কর্তা

২.৫ নিমিত্ত সম্বন্ধ

২.৬ প্রযোজ্য কর্তা

২.৭ বিষয়াধিকরণ

২.৮ বিধেয় কর্ম

২.৯ হেত্বর্থক করণ

২.১০ অনুক্ত কর্তা,

২.১১ করণের বীপ্সা

২.১২ বাক্যাংশ কর্ম,

২.১৩ সমধাতুজ কর্ম,

২.১৪ উপবাক্যীয় কর্তা

২.১৫ তারতম্যবাচক অপাদান

৩.শব্দরূপ লেখো :

৩.১ ‘মানুষ’

৩.২ ‘তুমি’ শব্দের সম্ভ্রমার্থের রূপ

৩.৩ ‘আমি’ ৩.৪ ‘সে’

৪.মুখ্য কর্ম ও গৌণকর্মের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও। কর্তৃকারক ও কর্মকারকে কখন কখন বিভক্তির একরূপ দেখা যায়, দৃষ্টান্ত দাও।

৫.একটি করে বাক্য রচনা করে নীচে উল্লিখিত কারকগুলিতে ‘এ’ বিভক্তির ব্যবহার দেখাও :

কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্ত কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক

৬.নিম্নরেখ পদগুলির কারক নির্ণয় করো :

৬.১ রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে।

৬.২ দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা।

৬.৩ আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে।

৬.৪ তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় সমুদ্র থেকে।

৬.৫ তা বলে দুনিয়ার সব প্রাণীই কুইক মার্চ করে যেতে দৌড়য় না।

৬.৬ সেই তো আমার পদক পাওয়া।

৬.৭ আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

৬.৮ আমার অনুরোধে উনি অনেকবার ‘যুগান্তরে’র জন্য লেখা দিয়েছিলেন।

৬.৯ আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু।

৬.১০ আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না।

নির্মিতি

পত্ররচনা

ব্যক্তিগত/পারিবারিক পত্র

• বার্ষিক পরীক্ষার পর প্রিয় বন্ধুকে গ্রামে বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র:

নতুন গ্রাম, বর্ধমান
২০-১২-২০১৪

প্রিয় নীতা,

অনেক চিন্তা আর না ঘুমিয়ে কাটানো রাতের পর এখন আমরা নিশ্চিন্ত, বল? হস্টেল থেকে ফিরে প্রথম দিকে বাড়িতে বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু এখন কয়েকজনের জন্য বেশ ফাঁকা লাগে। তুইও তাদের মধ্যে একজন। থাকিস তো কলকাতায়। চলে আয় না আমাদের গ্রামে! ভীষণ ভালো লাগবে।

এখান থেকে গঙ্গা দু-মিনিটের হাঁটা পথ। বিকেলে দু-জনে নদীর ধারে বসে গল্প করব, সূর্যাস্ত দেখব। সকালটাও দারুণ লাগবে। ধান ওঠার পর এখন আমাদের গ্রামের ক্ষেতগুলোতে কড়াই চাষ হচ্ছে। সবুজ হয়ে আছে মাঠ। চাষিরা ভোরের দিকে মাঠে কাজ করার সময় কিছু শুকনো ঝোপে আগুন লাগিয়ে কেমন হাত-পা সেঁকে নেয়। দেখাব খেজুর গাছ থেকে কীভাবে রস বার করে শিউলিরা। সেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হয়। আর রাতে দেখবি সত্যিই আকাশে তারা ফোটে আর বাঁশঝাড়ে আলো জ্বালে জোনাকির দল। শেয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক। এসবই প্রকৃতি তোকে বিনা পয়সায় দেখাবে। চলে আয় নীতা। অপেক্ষা করছি তোর জন্য।

ইতি

তোর প্রিয় বন্ধু

সুদীপা।

প্রযত্নে : রসময় সরকার

৩নং রাজা সুবোধ মল্লিক

স্কোয়ার,

কলকাতা- ৭০০ ০১৩

- **২১ ফেব্রুয়ারি তোমার বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রিয় বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো :**

রাজারহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা

১১.১.২০১৫

প্রিয় রুহুল,

আশা করি ভালো আছিস। নতুন ক্লাসে নিশ্চয়ই লেখাপড়া জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে। সামনেই ২১ ফেব্রুয়ারি। তুই তো জানিস ১৯৯৯ থেকে ইউনেসকো-র ঘোষণা অনুযায়ী দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। উর্দু-কে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় আব্দুল জব্বার, রফিক উদ্দিন, আবুল বরকত, সালাম, শফিউর রহমান প্রমুখ পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করেন। এই ভাষা-শহিদদের

সুমহান আত্মবলিদানের কথা আমরা এই দিনটিতে স্মরণ করে থাকি। প্রতিবছরের মতো এবছরও আমাদের বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হবে। ওই দিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি কবি শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি আবৃত্তি করব।

গত বছর ইচ্ছে থাকলেও বাড়িতে অসুবিধা থাকায় তুই আসতে পারিসনি। এবার অনেক আগে থেকে বললাম। অবশ্যই আশা চাই কিন্তু। আশাকরি এই অনুষ্ঠানটি তোর কাছে খুবই মনোজ্ঞ হয়ে উঠবে। ভালো থাকিস।

প্রযত্নে : সন্দীপ দাস	অনেক শুভেচ্ছাসহ
১০২ স্টেশন রোড,	তোর অভিন্নহৃদয় বন্ধু
সোদপুর কলকাতা -১১০	সৌরভ।

- **তোমার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিবরণ জানিয়ে বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো:**

বাগনান, হাওড়া

২২.১.২০১৫

প্রিয় শুভ,

অনেক দিন তোর কোনো খবরাখবর পাই না। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে শেষবার যে চিঠি লিখেছিলি, তার উত্তরও তো দিয়েছি মাসখানেক হয়ে গেল। নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দে পুরোনো পাড়ার আর বন্ধুদের কিন্তু ভুলে যাইনি একেবারেই। গত সপ্তাহেই আমাদের স্কুলে ৪৭তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আমাদের বিভাগের জন্য ছিল ১৫০মিটার দৌড়, বস্তা দৌড়, অঙ্ক দৌড়, ব্যালান্স রেস, উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রভৃতি। দুদিন ধরে আমাদের স্কুলেরই মাঠে মহড়া চলার পর গত শুক্রবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় অন্তিম বা চূড়ান্ত পর্ব। সারাদিন

খেলাধুলোর শেষে শিক্ষকদের হাঁটা রেস, দিদিমণিদের প্রদীপ জ্বালানো, সর্বসাধারণের জন্য ধীরে সাইকেল চালানো, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সফলদের হাতে এলাকার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদেরা পুরস্কার তুলে দেন। আমি অঙ্ক দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

তোদের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা লিখে জানাস। আর হ্যাঁ, সরস্বতী পুজোর সময় নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভালো থাকিস। কাকু-কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাস, ভাইকে আমার স্নেহাশিস দিস। আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি

প্রযত্নে : বিবেকানন্দ দে
গ্রাম + পোস্ট : বাড়গড়চুমুক
জেলা : হাওড়া
পিনকোড - ৭১১ ৩১২

তোর প্রিয় বন্ধু
কৌশিক

প্রশাসনিক পত্র

- **পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র**

মাননীয় পৌরপ্রধান,
খড়দহ পৌরসভা,
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা

বিষয় : সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন

মহাশয়,

আমরা আপনার পুরসভার অন্তর্গত ১১নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। আপনি অবগত আছেন

যে, প্রতি বছর বর্ষায় আমাদের ওয়ার্ড দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন হয়ে থাকায় এখানকার মানুষেরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। পানশিলার খালে আশেপাশের সব এলাকার জল এসে পড়ে এবং সেই জল বয়ে নিয়ে যাওয়ায় ক্ষমতা খালটির এখন নেই, কেন-না দীর্ঘদিন এর কোনো সংস্কার হয়নি। প্রায় মজে যাওয়া খালটির আশু সংস্কার প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রাচীন স্লুইসগেটটিরও মেরামতি প্রয়োজন।

সেচ বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে এই কাজে উদ্যোগী হওয়ার জন্য এলাকাবাসীর

পক্ষ থেকে আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ জানাই। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আসন্ন বর্ষায় নিদারুণ বিপর্যয় থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি।

ধন্যবাদান্তে
সৈকত ধর
১১নং ওয়ার্ডের
অধিবাসীদের পক্ষে
খড়দহ,
উত্তর ২৪ পরগনা

১৩ মার্চ, ২০১৪

- **অতিরিক্ত মাইক ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকার চেয়ে পৌরপিতার কাছে একটি চিঠি লেখো:**

মাননীয় পৌরপিতা মহাশয় সমীপেষু,
আরামবাগ পৌরসভা,
হুগলি

বিষয় : মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রার্থনা

মহাশয়,

আমরা আরামবাগ অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বছর দুয়েক আগে আমাদের অঞ্চলে 'কোলাহল গোষ্ঠী' নামে একটি সংঘ স্থাপিত হয়েছে। সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার নামে সেখানে সারাবছরই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান চলে। সরকারি বিধিনিষেধ

এবং এলাকাবাসীদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, কাজকর্ম, বিশ্রামকে গুরুত্ব না দিয়ে সেসব অনুষ্ঠানে সকাল থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত তারস্বরে মাইক বাজানো হয়। এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। সংঘ কর্তৃপক্ষের কাছে বারংবার আবেদন ও লিখিত অনুরোধ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি, বরং পরিস্থিতি আরো অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় আমরা আপনার সহৃদয় সহযোগিতা প্রর্থনা করি। আশা করি, আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের এই নিদারুণ শব্দযন্ত্রণার কবল থেকে মুক্ত করবেন।

নমস্কারান্তে

২৭ মার্চ, ২০১৪ বিনীত

আরামবাগ আরামবাগ অঞ্চলের

অধিবাসীবৃন্দ

- **অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলে। ছুটি মঞ্জুরের আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি পত্র রচনা করো :**

মাননীয়
প্রধান শিক্ষক মহাশয়,
সিন্দ্রানী সাবিত্রী উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম + পোস্ট - সিন্দ্রানী,
উত্তর ২৪ পরগনা

বিষয় : অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটি মঞ্জুরের আবেদন

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি শ্রীমান পলাশ মণ্ডল আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণি 'ক' বিভাগের ছাত্র, ক্রমিক নং-১। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত

হওয়ার কারণে আমি গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলাম।

উক্ত ক'দিনের ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করার অনুমতি দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

তারিখ
১২/৯/২০১৪
স্থান : সিন্দ্রানী

ইতি
একান্ত অনুগত ছাত্র
পলাশ মণ্ডল

বি.দ্র. : চিকিৎসকের শংসাপত্রের একটি প্রত্যয়িত নকল চিঠির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

- **বিদ্যালয় আয়োজিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করার অবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি পত্র রচনা করো :**

মাননীয়
প্রধান শিক্ষক মহাশয়,
বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ,
মুরাদপুর, চণ্ডীপুর,
পূর্ব মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৬২৫

বিষয় : শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করার আবেদন

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমি রাবেয়া খাতুন আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ‘খ’ বিভাগের ছাত্রী, ক্রমিক নং-২৩। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আগামী ২-১৫

নভেম্বর সপ্তম - অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দিল্লি ও আগ্রায় যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছে, আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে চাই। এ বিষয়ে আমার অভিভাবকেরও সম্মতি রয়েছে।

আপনার অনুমতি পেলে আমি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাবতীয় শর্ত পূরণে বাধ্য থাকব।

ইতি

তারিখ - ৩/১০/২০১৪ আপনার একান্ত

মুরাদপুর, চণ্ডীপুর অনুগত ছাত্রী

রাবেয়া খাতুন

হাতে কলমে

১.আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তোমার বিদ্যালয়ের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের কাছে একদিনের জন্য ছুটির আবেদনপত্র রচনা করো।

২.বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব করার আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৩.তুমি তোমার বিদ্যালয়ের সাহিত্যসমিতির সম্পাদক। এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৪.বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৫. বিদ্যালয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করার আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৬. তুমি কেন কম্পিউটার ক্লাসে যোগ দিতে চাও তা জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৭. বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় কিছু বই কেনার আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৮. বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলি জানতে চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো।

৯.তোমার বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো।

১০. একটি প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষে কিছুক্ষণ কাটানোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো।

১১. কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে কিছুক্ষণ কাটানোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো।

১২. বন্ধুর দীর্ঘ অসুস্থতায় আরোগ্য কামনা করে একটি পত্র রচনা করো।

১৩. তোমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের আবেদন জানিয়ে ডাকঘর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করো।

১৪. তোমাদের অঞ্চলে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো।

১৫. আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য নলকূপ স্থাপনের জন্য ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করো।

একটি প্রাচীন জলাশয়ের আত্মকথা

কে তুমি একলা কিশোর এই ঘন দুপুরবেলায় আমার বদ্ধ জলে ঢিল ছুঁড়ে ঘুম ভাঙালে? কী খেলছ? এদিকে এসো। পুরোনো দিনের কথা শোনাই তোমায়। পুরোনো সব মানুষজন, রীতিনীতি আর এই আমি, আমিও তো দেখতে দেখতে অনেক পুরোনো হয়ে গেলাম। আজ

আমার জলে পানা আর মানুষের ফেলা প্লাস্টিক আর অন্যান্য বর্জ্যে বোঝাই হয়ে আছে। দেখে বুঝতেই পারবে না আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে যখন আমায় খনন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তখন এই জল কত স্বচ্ছ আর সুন্দর ছিল। এ তল্লাটের সকল মানুষ তখন পানীয় হিসেবে আমার জলকেই ব্যবহার করত। আমার পাড় ছিল বাঁধানো, চারিদিকে ছিল চারটি সুদৃশ্য ঘাট। সকালে বিকেলে কলশি কাঁখে মেয়েদের চপল হাসিতে, শিশুদের কলরোলে আর বয়স্ক মানুষদের সমাগমে আমার পাড়গুলি জমজমাট হয়ে উঠত। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ ভাঙা অট্টালিকা, এটাই ছিল তখন জমিদারবাড়ি। তাঁরা ছিলেন দয়ালু। সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে তাঁরা কখনো মুখ ফিরিয়ে নেননি। শুনেছি আমার

প্রতিষ্ঠার বছরে প্রবল অনাবৃষ্টি ও খরায় মানুষের দুঃখ দেখে জমিদারের মা-ঠাকুরানির আজ্ঞায় আমাকে খনন করা হয়। সেই থেকে আমি কত মানুষের তৃষ্ণা মিটিয়েছি, কত পাখি, কত মাছ, কত জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ আমার আশ্রয়ে কত প্রজন্ম পার করে দিল। আমার নিজেরই তা খেয়াল নেই। সেইসব দিনের সাক্ষী কেবল ওই বুড়ো বট, আমি তার শিকড়ে রস যোগাই, সে আমার বুকে ছায়া ফেলে। শুনেছি, জমিদার বংশের উত্তরাধিকারীরা এই জমি-বাড়ি বেচে দেবে। ওই অট্টালিকা থাকবে না, কাটা পড়বে বুড়ো বট, আমাকেও হয়তো বুজিয়ে ফেলা হবে। তারপর একদিন, হে কিশোর, এখানে এসে তুমি দেখবে চোখ বাঁধানো সুদৃশ্য নতুন ইমারত। তার আগে আমার পাশে এসে একটু বোসো। আর কান

পাতো। বুড়ো বটের দীর্ঘশ্বাসে আমার বুকের ওঠা ঢেউয়ের তালে তালে জমা থাকা গল্পগুলো হয়তো শুনে ফেলতেও পারো।

পরিবেশরক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সুস্থ পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। অথচ সেই পরিবেশই মানুষের অনন্ত চাহিদা আর অপরিমেয় লোভের শিকার হয়ে ক্রমশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। বাতাস, জল, মাটিতে দূষণের মাত্রা

বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। যানবাহন আর কলকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ায় মানুষ সর্দিকাশি, হাঁপানি, নিউমোনিয়ার মতো অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে বা তার ব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাছপালা, এমনকী জড় জগৎও। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার আর কীটনাশক জ্বালানি, হিসেবে ব্যবহৃত তেল জলকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে তুলছে। এসব বর্জ্যে, শহরাঞ্চলের আবর্জনায় আর জঞ্জালে মাটিও দূষিত হচ্ছে। যানবাহনের প্রবল শব্দ, শব্দবাজি, মাইক্রোফোনের উচ্চশব্দ স্নায়ুতন্ত্রকে বিকল করে দিচ্ছে, বধিরতা সৃষ্টি করছে, হৃৎস্পন্দনের হারে তারতম্য ও রক্তচাপের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠছে। পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও অস্ত্র পরীক্ষা তেজস্ক্রিয় দূষণকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে। যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে

সঙ্গে জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে মূল্য দিতে মানুষ তার উন্নতি আর স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে পরিবশেকে প্রতিনিয়ত আঘাত করেছে। উপেক্ষা করেছে প্রকৃতিকে। বাসস্থানের প্রয়োজনে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করেছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির লক্ষ্যে ভুলে গেছে পরিবেশের ভারসাম্যের দিকটিকে। এই দূষণের কবল থেকে বাঁচতে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে দায়িত্ব নিতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার পাশাপাশি তাকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে অদম্য প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত তরুণ ছাত্রসমাজ। কেননা তারাই ভবিষ্যতের সুনাগরিক। পরিবেশ সুরক্ষার পরিকল্পনা ও পরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্ব তারা নিলে তাদেরই ভবিষ্যৎ অনেক সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। যারা সচেতন নয়, তাদের সচেতন করে তোলার

লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে আসতে পারে। দলবদ্ধভাবে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন পোস্টার, চার্ট, ফেস্টুন তৈরি করে শোভাযাত্রার মাধ্যমে, বিদ্যালয়ে অরণ্য সপ্তাহ বা বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মতো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এ কাজে তারা সামিল হতে পারে। বৃক্ষরোপণ ও বনসংরক্ষণের ব্যাপারে, বায়ুদূষণ শব্দদূষণ বা জলদূষণ রোধে তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে নিজেদের দাবি জানাতে পারে। প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে পারে। দূষণমুক্ত পরিবশে গড়ে তোলার আবেদন জানিয়ে আলোচনা সভা ও পথনাটিকার আয়োজন করতে পারে।

এছাড়াও ক্যুইজ, বক্তৃতা, বিতর্ক, আলোচনাসভা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে, পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্প নির্মাণ, প্রাচীরপত্র লিখন,দেয়াল পত্রিকা লিখন

এবং সংবাদপত্রে প্রতিবেদন রচনার মাধ্যমেও পরিবেশ সুরক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

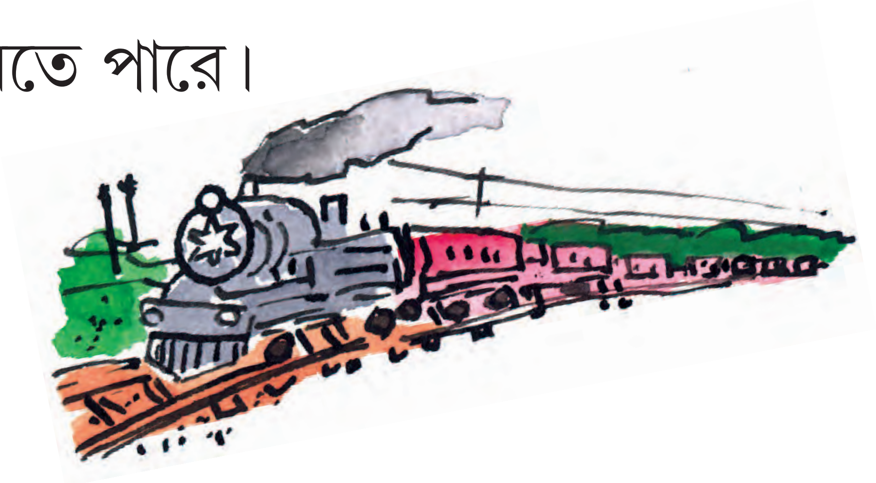

দেশভ্রমণ

বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশ্বে সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেশভ্রমণের সূচনা। অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা আর অচেনাকে চেনার দুর্নিবার আগ্রহে সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী, বৈচিত্র্যসন্ধানী চলিষ্ণু মানুষের ভ্রমণ ছিল অব্যাহত। জ্ঞানার্জনস্পৃহায় উৎসুক ছাত্রেরা দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছেন, রাজারা বেরিয়েছেন দিগ্বিজয়ে, বণিকেরা বাণিজ্যতরী চালিয়েছেন অকূল অনন্ত সমুদ্রে। বিশ্বব্যাপী শান্তি আর মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন ধর্মপ্রচারকেরা। পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস,

ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং প্রমুখ ভারতবর্ষে এসেছেন, দুঃসাহসিক অভিযানে সামিল হয়েছেন কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, আমেরিগো ভেসপুচি, হ্যারি জনস্টন, মার্কোপোলো, হাডসন, স্কট, শ্যাকলটনের মতো অভিযাত্রীরা। ভূপর্যটক কুক-ম্যাংলিন, স্টানলি-লিভিংস্টোনের কথাও সুবিদিত। এমনকী, নিছক আনন্দ আহরণের তাগিদেও ঘরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়েছে সাধারণ মানুষ। সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে সে তার স্পর্ধিত পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, উড়িয়ে দিয়েছে তার বিজয় পতাকা। অসীম কৌতূহলে সে স্পর্শ করেছে সমুদ্রের সুগভীর তলদেশকে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিজের আধিপত্যকে কায়েম করেছে।

প্রতিকূল আর ঝুঁকিপূর্ণ পথে ভ্রমণ আধুনিক যুগের নানাবিধ আবিষ্কারের সুবাদে এখন অনেক নিরাপদ, সুখকর, স্বচ্ছন্দ ও সুপরিকল্পিত হয়ে

উঠেছে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে ভ্রমণ স্থানগুলিতে বিলাসবহুল হোটেল, লজ, রিসর্ট, গেস্টহাউস, রেস্তোরাঁ গড়ে ওঠার পাশাপাশি 'হোম স্টে'তে থাকার সুবিধাও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। দ্রুতগামী সব যানবাহন ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রমকে সহজ ও অনায়াসসাধ্য করে দিয়েছে। এ ভাবেই পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব গড়ে তোলে।

ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, সেখানকার দর্শনীয় স্থান ও মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সম্পর্কে যেমন অবহিত হই, তেমনই সেখানকার মানুষজনের জীবনযাত্রা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, উৎসব-অনুষ্ঠান, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্য ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ভাষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এসবের সঙ্গে

পরিচিত হই। আমাদের এই পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের প্রসারতা বাড়ে, পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাবের বিনিময় হয়, দেশবিদেশের মানুষের সান্নিধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ রচিত হয়, কূপমণ্ডুকতা ঘুচে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

বই পড়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। পুঁথিসর্বস্ব নীরস তথ্যনির্ভর শিক্ষার আবেষ্টন ছেড়ে আমরা নতুন চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠি। ভ্রমণ সাহিত্যের ধারাটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশবিদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা মানসভ্রমণের অপার আনন্দ লাভ করে থাকি।

আমার প্রথম বাজার করার অভিজ্ঞতা

বাজারে তো ছোটোবেলা থেকেই যাই। ক্লাস ফাইভের পর থেকে বাবা প্রতি রবিবার নিয়ম করে আমাকে নিয়ে বাজারে যান। বাবা বাজার করেন আর আমাকে বলতে থাকেন দুনিয়ার হাল হকিকত। আমিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি কর্মব্যস্ত মানুষের চলাফেরা, হাঁকাহাঁকি, দরদাম, দেখি কীভাবে প্রকাণ্ড সব বোঝা মাথায় নিয়ে মুটে চলেছেন, মাছওলা মস্ত বড়ো বঁটি দিয়ে ঘ্যাঁচ

ঘ্যাঁচ করে মাছ কাটছেন, বুড়ি তরকারিউলি চোখের একদম সামনে হাত এনে গুনে নিচ্ছেন খুচরো পয়সা। এইভাবে বাজারের অনেকের সঙ্গেই আমার বেশ আলাপ হয়ে গেছে। এই তো সন্ধ্যা পিসি আছেন, তরকারি বেচেন, আমি গেলেই হাতে একটা শসা কি টমেটো কি কতগুলো মটরশুঁটি ধরিয়ে দেবেন। তক্ষুনি খেতে হবে। দাম দিতে গেলে কী রাগারাগি! আসলে বাবা সকলের সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করেন যে সবাই বাবাকে খুব ভালোবাসেন আর শ্রদ্ধা করেন। আমিও বাবার দেখাদেখি সক্কলকে 'আপনি'- করে বলি আর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করি। তাই আমাকেও সবাই বেশ ভালোই বাসেন বলে মনে হয়। তাই প্রথম যেদিন আমাকে একা বাজারে যেতে হয়েছিল, আমি মোটেও ভয় পাইনি। বাবা কোনো একটা কাজে বাইরে

গেছিলেন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল ছোটোমামারা আসছেন। মা তো একইসঙ্গে খুব খুশি আর ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িতে এত কাজ অথচ বাজার প্রায় কিছুই নেই। তখন আমিই বললাম যে, চিন্তার কিছু নেই। আমি তো বাজার কীভাবে করতে হয় জানিই। মা প্রথমে ভরসা করতে না পারলেও শেষ অবধি অন্য উপায় না দেখে বাজারের থলে, জিনিসপত্রের ফর্দ আর একশো টাকার একটা নোট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। এত টাকা এর আগে কখনো ছুঁইনি। নিজেকে বেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত আর বড়ো-বড়ো মনে হতে লাগল। বুক ফুলিয়ে বাজারে ঢুকতেই কিন্তু চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো আমার সাহসও দমে গেল। এত লোক, হই-হট্টগোল আর দৌড়াদৌড়ির মধ্যে নিজেকে বেশ অসহায়

লাগছিল। বাবার হাতটা শক্ত করে ধরতে না পারলে এখনো যে বাইরের পৃথিবীটাকে অচেনা আর কঠিন মনে হয়, বুঝতে পারলাম। সিঁটিয়ে আছি, এমন সময় একজন দেখি জিজ্ঞেস করলেন, ‘মাস্টারমশাই তোমার বাবা হন, না?’ আমি মাথা নাড়াতেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘একা একা বাজার করতে এসেছ?’ আমি আবার ‘হ্যাঁ’ বলায় ভদ্রলোক একটু অবাকই হলেন মনে হলো। তারপর বললেন, ‘চলো দেখি’। আমি সংকোচের সঙ্গে তাঁর পিছু নিলাম। একে একে ফর্দ মিলিয়ে সবকিছু কেনা হলো। দোকানিরাও আমাকে একা দেখে অবাক, খুশিও। বুড়ি দিদা অনেকগুলো পিঁয়াজকলি ফাউ দিলেন। ফাউ এনেছি শুনলে মা বকবেন, তাই আমি বারবার দিদাকে বলে দিলাম যাতে কাউকে না বলেন। সেই ভদ্রলোক কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকলেন। বাজার

শেষ হবার পর পয়সা-টয়সা গুনে দেখা গেল তেত্তিরিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা বেঁচেছে। ভদ্রলোক নিজে হাতে সমস্ত বাজার নিয়ে আমাকে বাড়ি ছেড়ে দিলেন। পরে জানলাম তিনি বাবার প্রাক্তন ছাত্র, এখন বাজার কমিটির সেক্রেটারি। মা অবশ্য তাঁকে চা আর হাতে বানানো কেক না খাইয়ে ছাড়লেন না। তিনিও খেতে খেতে আমার সাহস আর বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করলেন। তারপর মাকে নমস্কার করে আর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। মা থলে দেখে বললেন, 'চমৎকার বাজার হয়েছে, তবে শাহ্ আলম ছিল বলেই সবাই বেশি বেশি করে সবজি আর মাছ দিয়েছে।' ও, বলা হয়নি, ততক্ষণে জেনে গেছি ওই উপকারী মানুষটির নাম শাহ্ আলম কাকু। আমার প্রথম বাজার করাটা খুব স্বাধীনভাবে হলো না হয়তো, কিন্তু মা তো খুশি। যথেষ্ট!

● নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করো:

১.একটি চন্দ্রালোকিত রাতের অভিজ্ঞতা

২.একটি ঝড়ের রাতের অভিজ্ঞতা

৩.একটি শীতের দুপুরের অভিজ্ঞতা

৪.অরণ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

৫.একটি গ্রামে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

৬.তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

৭.বিদ্যালয় পত্রিকায় প্রথম তোমার লেখা মুদ্রিত হওয়ার অভিজ্ঞতা

৮.একটি মেলা দেখার অভিজ্ঞতা

৯.একটি প্রাচীন বটগাছের আত্মকথা

১০. একটি অচল পয়সার আত্মকথা

১১. একটি পোড়ো বাড়ির আত্মকথা

১২. একটি কাঠবেড়ালির আত্মকথা

১৩. একটি ব্যস্ত রেলস্টেশনের আত্মকথা

১৪. একটি পথের আত্মকথা

১৫. একটি পুরোনো খাতার আত্মকথা

১৬. একটি খেলার মাঠের আত্মকথা

১৭. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

১৮. পরিবেশ পরিষেবায় অরণ্য

১৯. আমাদের জীবনে পরিবেশের ভূমিকা

২০. প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ

২১. উন্নয়ন বনাম পরিবেশ

২২. পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

২৩. মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব

২৪. দেশভ্রমণের উপযোগিতা

২৫. শিক্ষামূলক ভ্রমণ

এককথায় প্রকাশ

একাধিক কথায় প্রকাশিত কোনো ভাবকে প্রয়োজন মতো একটি শব্দে প্রকাশ করাকে এককথায় প্রকাশ, একপদীকরণ, বাক্যসংকোচন বা বাক্‌সংহতি বলা হয়। ভাষাকে সহজ, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সুন্দর ভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে 'এককথায় প্রকাশ' বিশেষ ভূমিকা নেয়। এক্ষেত্রে অর্থের কোনোরকম পরিবর্তন না করেই বাক্যকে ছোটো কিংবা বড়ো করা যায়। এই চর্চার মধ্য দিয়ে ভাষার শব্দ সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব। সংক্ষিপ্ততা ও ঋজুতা এর প্রধান গুণ। বাক্যের রূপ পরিবর্তনে 'এককথায় প্রকাশ' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরের পাতায় তোমাদের জন্য এমনই কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

১.অণুকে যার দ্বারা দেখা যায়— অণুবীক্ষণ

২.অতিথির অ্যাপ্যায়ন — আতিথ্য/আতিথেয়তা

৩.অর্থহীন উক্তি — প্রলাপ

৪.অতি দুর্গম স্থান— গহন

৫.আয়ুর পক্ষে হিতকর— আয়ুষ্য

৬.আসল কথা বলার আগে মুখবন্ধ — ভণিতা

৭.আয় বুঝে ব্যয় করে যে— মিতব্যয়ী

৮.আগমনে যার কোনো তিথি নেই — অতিথি

৯.ইন্দ্রের হস্তী— ঐরাবত

১০. ইতিহাস জানেন যিনি— ঐতিহাসিক

১১. ঈশানকোণের অধিপতি— শিব

১২. উপযুক্ত বয়স হয়েছে যার— সাবালক

১৩. উভয় পাশে বৃক্ষশ্রেণিযুক্ত পথ— বীথি

১৪. উৎকৃষ্ট কাজ— সুকৃতি

১৫. উপন্যাস রচনা করেন যিনি— ঔপন্যাসিক

১৬. উল্লেখ করা হয় না যা— ঊহ্য

১৭. ঊর্ধ্ব ও বক্রভাবে যা গমন করে— তরঙ্গ

১৮. ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি— ঋত্বিক

১৯. একই সময়ে বর্তমান— সমসাময়িক

২০. এক পাড়ার লোক— পড়শি

২১. ঐক্যের অভাব— অনৈক্য

২২. ওজন করে যে ব্যক্তি— তৌলিক

২৩. ঔষধের জন্য ব্যবহৃত গাছ-গাছড়া— বক্কাল

২৪. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে যে— যাযাবর

২৫. কোথাও উঁচু কোথাও নীচু— বন্ধুর/উচ্চাবচ

২৬. কোনো কিছুর চারদিকে আবর্তন— পরিক্রমা

২৭. শ্বেতবর্ণের পদ্ম— পুণ্ডরীক

২৮. পরিব্রাজকের জীবন বা বৃত্তি— প্রব্রজ্যা/ পরিব্রজ্যা

২৯. বৎসের প্রতি গভীর স্নেহ— বাৎসল্য

৩০. ব্যাকরণ জানেন যিনি— বৈয়াকরণ

৩১. যৌগিক অথচ বিশেষ একটি অর্থে সীমাবদ্ধ শব্দ— যোগরূঢ়

৩২. কুকুরের ডাক— বুক্কন

৩৩. একবার শুনলেই যার মনে থাকে— শ্রুতিধর

৩৪. রাত্রিকালীন যুদ্ধ — সৌপ্তিক

৩৫. সর্বজনের কল্যাণে— সর্বজনীন

৩৬. স্থপতির কাজ— স্থাপত্য

৩৭. হৃদয়ের প্রীতিকর— হৃদ্য

৩৮. শিক্ষালাভই যার উদ্দেশ্য— শিক্ষার্থী

৩৯. যার দুটি হাতই সমান দক্ষতায় চলে— সব্যসাচী

৪০. সুধাধবলিত গৃহ— সৌধ

৪১. পুণ্যকর্মের ফলশ্রবণ— ফলশ্রুতি

৪২. পৃষ্ঠ (পশ্চাৎ) থেকে যিনি পোষকতা করেন— পৃষ্ঠপোষক

৪৩. বয়সের তুল্য সখা— বয়স্য

৪৪. নৌ চলাচলের যোগ্য— নাব্য

৪৫. কাজ করতে দেরি করে যে— দীর্ঘসূত্রী

৪৬. স্বপ্নে শিশুর হাসিকান্না — দেয়ালা

৪৭. চৈত্র মাসের ফসল— চৈতালি

৪৮. খে (আকাশে) চরে যে— খেচর

৪৯. ইন্দ্রজালে পারদর্শী— ঐন্দ্রজালিক

৫০. যা উদিত হচ্ছে— উদীয়মান

১.অর্থ ও ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে নীচের বাক্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত করো :

১.১. তাঁর কোনো কিছুতেই ভয় নেই।

১.২. সে খুব বেশি কথা বলে।

১.৩. তমাল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথা বলে।

১.৪. সুজন হরেক রকম বোল বলতে পারে।

১.৫. হাতি চলার রাস্তার দুধারে বড়ো বড়ো গাছ।

১.৬. সুধার মতো ধবল গৃহ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

১.৭. রোজের উপার্জন ভুলে সে আর্তের সেবা করে চলেছে।

১.৮. যাঁর কিছু নেই, ঈশ্বর তাঁর সহায় হন।

১.৯. আমাদের বিদ্যালয়ের বীক্ষণাগারে একটি মাথার খুলি রয়েছে।

১.১০. দিনের শেষ ভাগে এবার বাড়ি ফেরার পালা।

২.নীচের বাক্যগুলিকে প্রসারিত করো :

২.১. আজ সন্ধ্যায় প্রহসন দেখতে যাব।

২.২. জিঘাংসা নিন্দনীয়।

২.৩. পল্লবগ্রাহী হয়ে কোনো লাভ নেই।

২.৪. সর্বজনীন উৎসবে সামিল হব।

২.৫. পাঞ্চজন্য বেজে উঠেছে।

২.৬. ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

২.৭. উদ্বাস্তুদের সাহায্য করো।

২.৮. আধিকারিকেরা আসবেন।

২.৯. অর্ঘ্য সাজাও।

২.১০. ডাকহরকরাদের গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে।

৩.স্তম্ভ মেলাও :

'ক'	'খ'
অকুণ্ঠ ব্যয়শীল ব্যক্তি	সাক্ষর
অতি নিপুণ কারিগর	বকলম
অতিশয় দুর্গম স্থান	আর্য
অন্যের হয়ে যে স্বাক্ষর করে	মুক্তহস্ত
অগভীর সতর্ক নিদ্রা	ধারাবাহিক
অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত করেছে যে	আরূঢ়
আরোহণ করেছে যে	জয়ন্তী

'ক'	'খ'
ঈষৎ উষ্ণ	বলভি
উপকার করার ইচ্ছা	পারিতোষিক
ঋষির উক্তি	উপচিকীর্ষা
একটি ধারা বয়ে চলে যা	ঠাকুরালি
কাচের তৈরি ঘর	গহন
গমন করে যে	পটুয়া
ঘটনার বিবরণ দান	নগ
চৈত্রমাসের ফসল	প্রতিবেদন
ছাদের উপরকার ঘর	শিশমহল
জয়সূচক উৎসব	কবোষ্ণ
ঠাকুরের ভাব	ওস্তাগর
তুষ্ট মনে যা দেওয়া হয়	চৈতালি
পট আঁকেন যিনি	কাকনিদ্রা

বাগ্‌ধারা

কোনো ভাষায় সাধারণভাবে বিশিষ্ট অর্থে বা ব্যঙ্গার্থে বা একাধিক পদ নিয়ে গঠিত যেসব বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয় তাদের বাগ্‌ধারা, বাগ্‌বিধি বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বলে।

বাগ্‌ধারাকে অনেকে একধরনের বাগ্‌ভঙ্গি বলেছেন। এই বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিকে ইংরেজিতে Idiom বলা হয়। এক্ষেত্রে বাগ্‌ধারাগুলিকে শব্দার্থে বা বাচ্যার্থে গ্রহণ করা চলে না। বিশেষ অর্থেই এগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার ফলে বাক্যের ভাব তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা লাভ করে। এই অধ্যায়ে তোমাদের জন্য কিছু কথ্য, গ্রাম্য, আঞ্চলিক বাগ্‌ধারা আর তাদের বিশেষ অর্থ দেওয়া হলো। এবার তোমরা সহজেই পূর্ণবাক্যে তাদের ব্যবহার করতে পারবে।

১. অকালের বাদলা --- অসময়ে বা অপ্রত্যাশিত ঝামেলা বা বিপদ

২. আক্কেল গুড়ুম — স্তম্ভিত ভাব, হতবুদ্ধি অবস্থা

৩. ইঁদুরের কলে পড়া — লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া বা আটকে পড়া

৪. উচ্ছন্নে যাওয়া --- অধঃপাতে যাওয়া, চরিত্রের অবনতি হওয়া

৫. এঁচড়ে (ইঁচড়ে) পাকা — ডেঁপো, জ্যাঠা, অকালপক্ব, অল্প বয়সেই পেকে গেছে এমন (এঁচড়ে পাকা ছেলে)

৬. এঁটোকাঁটা — খাবার পর যেসব উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে

৭. একাই একশো — একাই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সামলাতে পারে এমন

৮. ওজন বুঝে চলা — মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা

৯. কড়ায় গণ্ডায় — সূক্ষ্ম হিসাব মতো, হিসাবে কিছুই বাদ না দিয়ে

১০. করাতের দাঁত — উভয় সংকট

১১. কূপমণ্ডূক — কুনো বা সংকীর্ণচেতা লোক

১২. খাতা খোলা — হিসাব পত্র আরম্ভ করা, লেনদেন শুরু করা

১৩. গড্ডলিকা প্রবাহ — ভালোমন্দ বিচার না করে সকলে যা করে তাই অনুসরণ করে এমন লোকের দল

১৪. গলগ্রহ — দায় বা বোঝা

১৫. ঘর আলো করা — ঘরের বা পরিবারের শোভা বা গৌরব বৃদ্ধি করা

১৬. ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া — উপরওলাকে উপেক্ষা করে বা অতিক্রম করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা

১৭. ঘোল খাওয়া — নাকাল বা জব্দ হওয়া

১৮. চড়ুইপাখির প্রাণ — ক্ষীণজীবী, অত্যন্ত দুর্বল লোক

১৯. চোখে চোখে রাখা — দৃষ্টির আড়ালে যেতে না দেওয়া, সতর্ক দৃষ্টি রাখা

২০. ছড়ি ঘোরানো --- অশোভন বা বিরক্তিকরভাবে সর্দারি/মাতব্বরি করা

২১. জড়ভরত — জড়বুদ্ধি বা জড়তাগ্রস্ত লোক

২২. ঝড় তোলা — প্রবল ব্যস্ততা বা গতিসম্পন্ন উদ্যোগ শুরু করা

২৩. টিপ্পুনি কাটা --- ছোটো-ছোটো বাঁকা/ঝাঁঝালো উক্তি/মন্তব্য করা

২৪. ঠিকে কাজ — নির্দিষ্ট মজুরিতে কাজ

২৫. ড্যাং ড্যাং করে — কাউকে কোনো তোয়াক্কা না করে/বিজয়গর্বে

২৬. ঢোঁক গেলা — কথা বলার সময় ইতস্তত করা

২৭. তড়বড় করা — তাড়াহুড়ো করা/অত্যধিক ব্যস্ততার ভাব দেখানো

২৮. থাতামুতো দেওয়া — জোড়াতালি দেওয়া/ দায়সারাভাবে করা

২৯. দরকচা — কাঁচাও নয় পাকাও নয় এমন অবস্থা

৩০. ধড়ে প্রাণ আসা — বিপদ থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখে বা উদ্ধার পাওয়ায় স্বস্তিলাভ

৩১. নয়-ছয় করা — তছনছ করা/পণ্ড করা/ অপব্যয় করা

৩২. পটের বিবি — সেজেগুজে বসে থাকে এমন বিলাসী ও নিষ্কর্মা মেয়ে

৩৩. ফাটাকপাল — মন্দভাগ্য

৩৪. বাঘা-বাঘা — বিরাট/বড়ো-বড়ো

৩৫. ভাঁড়ে মা ভবানী — ভাণ্ডার শূন্য/একেবারে দরিদ্র/নিঃস্ব অবস্থা

৩৬. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা — দুর্বল/বিপন্ন লোকের উপর পীড়ন

৩৭. যত নষ্টের গোড়া — সবরকম অন্যায় বা ক্ষতির আসল কারণ

৩৮. রাঘব-বোয়াল — অত্যাচারী এবং অন্যের ধনসম্পদ আত্মসাৎকারী প্রভাবশালী লোক

৩৯. লক্ষ্মীর বরযাত্রী — সুসময়ের বন্ধু/সঙ্গী

৪০. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা — কুকর্ম গোপন করার বৃথা চেষ্টা

৪১. ষাঁড়ের গোবর — অকর্মণ্য/অপদার্থ লোক

৪২. সর্বঘটে কাঁঠালি কলা— সব ব্যাপারেই যে অবাঞ্ছিত/বিরক্তিকরভাবে উপস্থিত থাকে।

নীচের প্রতিটি বাগ্‌ধারাকে বাক্যে প্রয়োগ করো:

১. হরিহর আত্মা

২. শিরে সংক্রান্তি

৩. হাতের পাঁচ

৪. মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম

৫. বাস্তুঘুঘু

৬. বালির বাঁধ

৭. ভূতের বেগার

৮. বিনা মেঘে বজ্রপাত

৯. ভস্মে ঘি ঢালা

১০. ভাগের মা

১১. বকধার্মিক

১২. বিদুরের ক্ষুদ

১৩. দিল্লিকা লাড্ডু

১৪. নয়-ছয়

১৫. তীর্থের কাক

১৬. পগার পার

১৭. ঠোঁটকাটা

১৮. টাকার কুমির

১৯. গোকুলের ষাঁড়

২০. ছাইচাপা আগুন